হিউম্যান বিয়িং

শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব

ইফতেখার সিফাত

হিউম্যান বিয়িং

শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব

গ্রন্থনা
ইফতেখার সিফাত

সম্পাদনা
মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

নাশাত

হিউম্যান বিয়িং
শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব

লেখক : ইফতেখার সিফাত
সম্পাদক : মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০২০

প্রকাশক
নাশাত পাবলিকেশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৫১১৮০৮৯০০, ০১৭১২২৯৮৯৪১

প্রচ্ছদ : হামীম কেফায়েত

মূল্য : ২২০ (দুইশত বিশ) টাকা মাত্র

উৎসর্গ

মুফতি মাহবুবুর রহমান, মুফতি হামিদুর রহমান এবং প্রিয় আহমাদ আলী নাজমী স্যার। বাবা মায়ের পর আমার দীনি জীবনের নানা ক্ষেত্রে এই তিনজন মানুষের মৌলিক অবদান অনেক। একজন আমার ইলমি পথ সুগম করেছেন, অপরজন আমার ফিকরি সফরের পাথেয় যুগিয়েছেন। আরেকজন আমার লেখার হাতেখড়ি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাদের সকলকে উপযুক্ত বদলা দান করুন এবং সত্য পথের পথিক হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

ইফতেখার সিফাত

নাশাত-এর আরও কিছু বই

খোলাসাতুল কোরআন/ মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম শেখোপুরী
ইসলাম ও মুক্তচিন্তা/ মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন
গুনাহ থেকে বাঁচুন/ মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ.
রাজকুমারীর আর্তনাদ/ খাজা হাসান নিজামি
(সিপাহি-বিপ্লব পরবর্তী মোগল পরিবারের করুণ ইতিহাস)
তুরস্কে পাঁচ দিন/ ড. মুসতফা কামাল
(মাওলানা জুলফিকার আহমাদ নকশবন্দির ঈমানদীপ্ত সফরনামা)
কিংবদন্তির কথা বলছি/ আহমাদ সাব্বির
(মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রহ. এর জীবনের গল্পভাষ্য)

অভিব্যক্তি

প্রায়ই ভাইয়েরা প্রশ্ন করেন, তাদের কোনো ভাই বা বন্ধু দীনের দিকে ঝুঁকছেন, কোন বই পড়তে দেবেন? অনেক ভাইবোন কমেন্টে কুরআনের নানান প্রকাশনীর তরজমা সাজেস্ট করেন। কিংবা অনেক ভাই-ই দীনের পথচলা শুরু করেন কুরআনের তরজমা দিয়ে। নিঃসন্দেহে কুরআন-ই তো আমাদের চিন্তাচেতনার মূলকেন্দ্র, মূলসূত্র। কিন্তু দীনের জ্ঞান অর্জন কুরআন দিয়ে শুরু করার ব্যাপারে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

আমার একজন পরিচিত ব্যক্তি। হজ করে এসে দীনি জ্ঞান অর্জন শুরু করলেন। কিছুদিন পর কথায় কথায় আমাকে বললেন যে তিনি কুরআনের তরজমা পড়ছেন। মহর আর যৌনকর্মীর পারিশ্রমিকের মধ্যে তিনি কোনো পার্থক্য খুঁজে পেলেন না।

আরেকজন কাছের মানুষ, কুরআনের তরজমা দিয়ে যার দীনি পড়াশোনা শুরু। তার অনুভূতি হলো বর্তমান ইসলাম হলো উগ্রবাদ, মোল্লাদের তৈরি। কুরআনের ইসলাম এতো কঠিন না। এরকম বহু নজির আপনার আশেপাশেই পাবেন। সব ভ্রান্ত ফিরকা নিজেদের মতো করে কুরআন থেকেই দলিল দেয়। আবার শুধু কুরআনের উপর ভিত্তি করে ভ্রান্ত দলের অস্তিত্বও আমাদের অজানা নয়। আচ্ছা, কেন এমন হয়! সাহাবায়ে কেরামের প্রথম শিক্ষা তো কুরআনই ছিল, তারা তো বিভ্রান্ত হননি!

দুটো কারণ আছে এমন হবার—

এক. কুরআন বুঝিয়ে দেবার কাউকে থাকতে হবে। সাহাবিদের কুরআন বুঝিয়ে দিতেন খোদ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এভাবে প্রতি প্রজন্মে এই বুঝ ট্রান্সফার হয়েছে। এই ধারাবাহিক কমন বুঝটার বাইরে নিজের মতো করে বুঝতে গিয়েই সমস্যাগুলো হয়েছে। একজনকে তো অবশ্যই থাকতে হবে, যিনি আমাকে এই আদি ব্যাখ্যা (নবীজি ও সাহাবিদের বুঝটুকু) বুঝিয়ে দেবেন। এটা সত্যি যে, ব্যস্ততার দরুন এমন কারও কাছে বসে কুরআন পড়ে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

এর একটা সমাধান হতে পারে— কোনো সহজ তাফসির (ব্যাখ্যাসহ তরজমা) নেওয়া, এবং পড়ার সময় কোনো জায়গায় না বুঝলে টুকে রাখা। সেই জায়গাগুলো কোনো আলিমের কাছে সুবিধাজনক সময়ে বসে ক্লিয়ার করে নেওয়া। শুধু তরজমা পড়াকে এজন্যই নিরুৎসাহিত করা হয়। কারণ প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা ভালো না। আর দীনের 'পয়লা পাঠ' হিসেবে তো আমি সরাসরি নিষেধই করব।

কেন? এটাই আমাদের দ্বিতীয় কারণ। আমরা জেনারেল কারিকুলামে পড়াশোনা করেছি, যা ব্রিটিশ-প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা-কাঠামো। এই উপমহাদেশের ট্র্যাডিশনাল শিক্ষাধারাকে পরিবর্তন করে নতুন শিক্ষা প্রবর্তন করার সময় তাদের লক্ষ্য ছিল তৈরি করা 'এমন একটা শ্রেণি, যারা রক্তে-গায়ের রঙে তো ভারতীয়, কিন্তু রুচি-মতামত-নীতি-বিচারবুদ্ধিতে হবে ইংরেজ।'[১] ঠিক এই শ্রেণিটাই ইংরেজ খেদানোর পর ক্ষমতায় বসেছে, পলিসি করেছে, দেশ চালিয়েছে, বই লিখেছে। শুধু এরাই শিক্ষিত শ্রেণি, বাকিরা যেন গণ্ডমূর্খ। ফলে ইংরেজ চলে গেলেও, ইংরেজের রুচি-মত-নীতি-বিচারবুদ্ধিতেই আমরা উঠছি-বসছি-চলছি-ফিরছি-শিখছি। জেনারেশনের পর জেনারেশন আমরা বেড়ে উঠছি 'রঙে ভারতীয় ঢঙে ইংরেজ' হয়ে। আর ইংরেজদের এবং ইউরোপীয়দের চিন্তাচেতনার উৎস হলো গ্রিকদের বিশ্বদর্শন আর রোমানদের সমাজ-রাষ্ট্রবোধ। ১৪শ শতকে রেনেসাঁর সময় থেকে শুরু হয় খ্রিষ্টধর্মের খোলস থেকে বেরিয়ে আসার এই প্রক্রিয়া, শেষ হয় ১৮শ শতকে এনলাইটেনমেন্টে এসে। স্বাধীনতা-সমতা-নৈতিকতা-নিরপেক্ষতা-প্রকৃতিবাদ এসব চিন্তাদর্শন দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে তারা উপনিবেশের মওকায়। এগুলো শিখিয়ে তৈরি করেছে সেই শ্রেণি, যারা চিন্তা-মননে ইউরোপীয়। সেই শ্রেণিটাই আমাদের বাবাদের চিন্তা গড়ে তুলেছে, তারা আমাদের। প্রজন্মান্তরে আমরা সেই চিন্তাধারাই বহন করি, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।

---

[১] ১৮৩৪ সালে ভারতে শিক্ষাপ্রসারের জন্য কমিটি করা হয়। এর প্রধান ছিলেন লর্ড ম্যাকলে। স্কিমের রিপোর্ট- Minute on Indian Education, 2nd February, 1935; Thomas Babington Macaulay, point 12

এই চশমা পরে যখন কেউ কুরআন পড়ে, তখন একের পর এক প্রশ্ন জাগতে থাকে মনে। কেন মেয়েরা আদ্ধেক সম্পত্তি পেল? কেন মেয়েদের সাক্ষ্যের দাম ছেলেদের অর্ধেক? কেন আল্লাহ্ যুদ্ধ করতে বললেন? কেন চার বিয়ের অনুমতি? কেন দাসদাসীর বিধান? কেন এই, কেন সেই? স্বাভাবিক। কেননা এই ইউরোপীয় মানদণ্ড প্রতি গিঁটে গিঁটে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। এই ইউরোপীয় মূল্যবোধ বা ধারণাগুলোকে ওরা আমাদের 'চূড়ান্ত' 'ধ্রুব' 'সর্বৈব সত্য' 'নিপাতনে সিদ্ধ' ভাবতে শিখিয়েছে।[২] ফলে আল্লাহর দেওয়া দীন, আল্লাহর স্ট্যান্ডার্ডকে আমাদের কাছে বর্বর মনে হয়, মধ্যযুগীয় মনে হয়, সেকেলে মনে হয়। দুটো মাপকাঠির পার্থক্যটা দেখুন। একটা হলো গ্রিক-রোমান প্যাগানদের চিন্তাদর্শন 'নতুন বোতলে পুরোনো মদ'। আর একটা হলো স্বয়ং স্রষ্টা স্বয়ং অধিপতি পালনকর্তার প্রদত্ত, যিনি মানবমন-মানবসমাজ-মানবদেহের গতিপ্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। অথচ আজ আমরা মানবদর্শনের স্কেলে প্রশ্ন করছি আল্লাহর সিদ্ধান্তকে। আজ ইসলাম নিয়ে নাস্তিকদের যত প্রশ্ন, মডার্নিস্ট রিভিশনিস্ট মডারেট মুসলিমদের যত হীনম্মন্যতা সব কিছুরই উৎস এই পাশ্চাত্য মাপকাঠি ও পাশ্চাত্য ধারণাগুলোকে 'চূড়ান্ত' ঠাওরানোর প্রবণতা থেকে। এটাই সব প্রশ্নের, সব আপত্তির উৎস।

কুরআন থেকে হেদায়েত পেতে হলে সবার আগে এই ব্রিটিশ-ওয়াশ মগজখানি কাউন্টার ওয়াশ দিয়ে নিউট্রালে আনতে হবে। পশ্চিমা ভৌতবিজ্ঞান যেমন প্রমাণনির্ভর, তাদের সামাজিকবিজ্ঞান তেমন প্রমাণিত কোনো জিনিস না; বরং তা মতাদর্শনির্ভর। নিউটনের বলবিদ্যার সূত্র যেমন, পশ্চিমী অর্থনীতি-রাষ্ট্রবিজ্ঞান-সমাজবিজ্ঞানের ধারণাগুলো তেমন প্রশ্নাতীত বিষয় না। তাদের পুরো সামাজিকবিজ্ঞান

---

[২] Perennialism দর্শন। 'For Perennialists, the aim of education is to ensure that students acquire understandings about the great ideas of Western civilization. These ideas have the potential for solving problems in any era. The focus is to teach ideas that are everlasting, to seek enduring truths which are constant, not changing, as the natural and human worlds at their most essential level, do not change.' [Philosophical Perspectives in Education, Oregon State University ওয়েবসাইট]

দাঁড়িয়ে আছে একটা সংজ্ঞার উপর—ব্যক্তি, হিউম্যান। human, person, individual— এগুলোর দার্শনিক যে সংজ্ঞা, তার উপরেই পরিবারের সংজ্ঞা, সমাজের সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, অর্থনীতির সংজ্ঞা, আইনের সংজ্ঞা, অধিকার-স্বাধীনতা-সমতা-নৈতিকতা সবকিছুর ধারণা। পুরো পশ্চিমা সভ্যতা এর উপর দাঁড়িয়ে আছে, তাই পশ্চিমা চিন্তা-মনন বুঝতে হলে এই human-এর সংজ্ঞাটা বুঝতে হবে। humanity আর humanism-এর পার্থক্যটা জানতে হবে। এই ধারণাটা বুঝে নিলেই ইসলাম নিয়ে এতো এতো প্রশ্ন কোত্থেকে আসে, চট করে ধরে ফেলা যাবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে যে সেক্যুলার লিবারেল মূল্যবোধকে 'প্রশ্নাতীত' হিসেবে, ধর্মীয় অনুশাসনের মতো 'প্রশ্ন ওঠানো ট্যাবু' হিসেবে মন-মগজে গেঁথে দেওয়া হয়েছে; বিভিন্নভাবে মেনে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে—তা ধরা দেবে উপলব্ধিতে।

একজন ব্রিটিশ-ওয়াশ মুসলিমকে প্রথম কোন বইটা দেওয়া যায়, সে ভাবনা আর নেই। উসতায ইফতেখার সিফাত হাফিজাহুল্লাহকে দিয়ে আল্লাহ সেই কাজটুকু নিয়েছেন। নিঃসন্দেহে একজন জেনারেল শিক্ষিত মুসলিমের পড়া প্রথম বই হওয়া উচিত এই 'হিউম্যান বিয়িং' বইটি। যাতে তিনি নিজেকে চিনতে পারেন— আমি পশ্চিমা 'হিউম্যান' নাকি আল্লাহর 'আবদ'? 'কোন পরিচয়ে আমি কবরে যেতে চাই'? এটা তো সেই আত্মজ্ঞান, যা একজন মুসলিমের প্রয়োজন হয় তার বালেগ হবার সাথে সাথে। আর একজন নওমুসলিমের প্রয়োজন হয় কালিমা পড়ার পরপরই। আল্লাহর দেওয়া নৈতিকতা অস্বীকারকারী 'হিউম্যান' হিসেবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চাই নাকি আল্লাহর দেওয়া নৈতিকতা মেনে তার দাস হিসেবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে চাই? এ সিদ্ধান্ত তো আমাকে কুরআন পড়ার আগেই নিতে হবে। তাই আমি প্রত্যেক মুসলিম ভাইকে অনুরোধ করব, নিজে পড়ার সাথে সাথে প্র্যাক্টিসিং-গাফেল সবার হাতে কীভাবে এই বই পৌঁছানো যায়, সেই ফিকির করি সবাই।

আর নাস্তিকদের প্রশ্নে আমরা শাখাগত জবাব দিয়ে দায়মুক্ত হই। ধরুন, একজন জিজ্ঞেস করল নবীজি এতো বিবাহ করেছেন কেন... (খিস্তিখেউড়)? শুধু এই প্রশ্নের জবাব পেলেই কি সে মুসলিম হয়ে যাবে? তার ক'টা প্রশ্নের জবাব দেবেন আপনি? নাকি ভালো হয় তার

প্রশ্নের উৎসমুখে একটা পাথর বসিয়ে দিলে? তা হলে এই বইটিই সেই পাথর। সে যে 'সেক্যুলার লিবারেল হিউম্যানিজম' ধর্মে বিশ্বাসী, সেই ধর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করলেই বাকি কাজ সহজ। উসতায ইফতেখার সিফাতকে আল্লাহ উত্তম জাযা দান করুন। আমার এখানে খুব একটা কাজ নেই বার-দুয়েক রিডিং পড়া আর টুকটাক রেফারেন্স জুড়ে দেওয়া ছাড়া। আল্লাহ, এই অসিলায় আমাকে মাফ করে দিন।

আর আমার-লেখকের-পাঠকের-সংশ্লিষ্ট সকলের হেদায়েতের মাধ্যম হোক 'হিউম্যান বিয়িং' বইটি।

শামসুল আরেফীন
৩০.৬.২০২০

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নিশ্চয় সকল তারিফ কেবল তার, যিনি আমাদের দীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়ে বাইরের সব কিছুকে জাহিলিয়্যাত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যিনি সমাজ থেকে জাহেলি সভ্যতাকে দূর করে আল্লাহর উলুহিয়্যাতের সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আরো রহমত এবং শান্তি বর্ষিত হোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার ও সাহাবিদের উপর, যারা ইসলামি সভ্যতাকে বিশ্বব্যাপী বিস্তার করেছেন এবং এই পথে নিজেদের কুরবান করেছেন।

পশ্চিমাবিশ্ব যে ইসলামের সাথে এক সামগ্রিক লড়াইয়ে লিপ্ত একবিংশ শতাব্দীতে এসে এই বিষয়ে কোনো মুসলিমের সন্দেহ থাকার কথা নয়। এই দ্বন্দ্ব সভ্যতার দ্বন্দ্ব। পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশ্ব-নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করার পর নিজেদের জন্য একমাত্র হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পরাজিত করে বিশ্ব-নেতৃত্ব গ্রহণ করার একমাত্র শক্তি ইসলামি সভ্যতার ভিতরেই আছে। ফলে পশ্চিমাবিশ্ব ইসলামের বিরুদ্ধে এক সামগ্রিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। সামরিক আগ্রাসনের পাশাপাশি এই যুদ্ধের আরো ভয়াবহ দিক হলো আদর্শিক আগ্রাসন, যাকে বলা যায় মনস্তাত্ত্বিক লড়াই।

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব। এই টপিকে অনেক ইসলামি চিন্তাবিদই বই লিখেছেন। বিগত শতাব্দীতে যারা এই বিষয়ে কাজ করেছেন, তাদের কাজগুলো তাদের সময়ের জন্য বর্তমানের তুলনায় বেশি প্রাসঙ্গিক ছিল। কারো লেখার ধরন ছিল পশ্চিমা দার্শনিকদের থিউরিসমূহের খণ্ডন, আবার কেউ কেউ তখনকার সমাজ-বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের সংঘাতকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমাদের সামনে দুটি সংকট এসে হাজির হয়েছে।

প্রথমত, মুসলিমবিশ্বের পরাজিত মানসিকতা, হীনম্মন্যতা কিংবা পাশ্চাত্য-মুগ্ধতা সীমাহীন বৃদ্ধি পাওয়া। ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে মুসলিমবিশ্বের আপস এবং পাশ্চাত্যকে ইসলামিকরণের প্রচেষ্টা জোরদার হয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রথমে উল্লেখকৃত সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে সমসাময়িক যেই বয়ান তৈরি করার প্রয়োজন ছিল, সেই জায়গাটায় বিরাট শূন্যতা রয়ে যাওয়া। অন্ততপক্ষে বাংলাভাষায় এই শূন্যতার কথা অস্বীকারের কোনো সুযোগ নেই। আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান এমনটাই।

প্রথম সংকটকে আমরা মডারেশন হিসেবে জানি। এটা মুসলিম-সমাজে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কীভাবে এবং কাদের মাধ্যমে এই সংকট দিন দিন বেড়েই চলছে- বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই এই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র রচনার দাবি রাখে। ফলে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে প্রথম সংকট নিয়ে আলোচনা থাকবে না। আমাদের আলোচ্য বিষয়, দ্বিতীয় সংকট। বর্তমান সময়ের ইসলামি স্কলারগণ প্রথম সংকট মোকাবিলা করার চেষ্টা করেননি, ব্যাপারটা মোটেই এমন নয়। তারা চেষ্টা করলেও পাশ্চাত্য সভ্যতা নিয়ে তাদের জানাশোনার একটা কমতি আছে। ফলে অধিকাংশই একদম জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলোতে হোঁচট খেয়েছেন। প্রতিরক্ষার জায়গা থেকে লিখতে গিয়ে অনেক সময় ইসলামের আপসহীন দাসত্বের বাণী থেকে সরে এসেছেন কিংবা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। পাশ্চাত্যের মূলকে না জানার পাশাপাশি সমাজ-বাস্তবতায় পাশ্চাত্যের প্রভাব অনুধাবন করারও অক্ষমতা তৈরি হয়েছে। যে বিষয়টি আসলে পাশ্চাত্যের প্রভাব সেটা আমাদের কাছে কোনো সমস্যারই মনে হচ্ছে না। বরং এটাকে আমরা গৌরবের কারণ বানিয়ে নিয়েছি। ফলে পাশ্চাত্যবিরোধী বক্তব্যেও পশ্চিমের ভয়াবহ প্রভাব লক্ষ করা যায়। সমস্যার মূল যখন চিহ্নিত হবে না তখন সমাধানও ভুল আসবে। এটাই নিয়ম। আর হচ্ছেও তাই। 'বাতিল যেভাবে আসবে তাকে সেভাবেই মোকাবিলা করতে হবে' এমন সরল-সোজা যুক্তির মারপ্যাঁচে পশ্চিমা সভ্যতাকে বরণ করে নেওয়ার সবক দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তারা ভুলে যায় হক এবং বাতিলের বিভাজন শুধু নামেই নয়, বরং উভয়ের মাঝে কাঠামোগত বিস্তর ফারাক রয়েছে। বাতিল যে পথে উন্নতি করবে হক সে পথে উন্নতি করতে পারবে না। বরং সে পথে হক বাতিলের সাথে একাকার হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কেউ আবার বিজ্ঞানকে মুসলিম সভ্যতার একমাত্র ভরসা বলে দাবি করছে; অথচ বিজ্ঞান কোনো সভ্যতার উত্থানের সূত্র নয়, ফলমাত্র। উপর্যুক্ত বাস্তবতাগুলো সামনে রেখেই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে পাশ্চাত্যের মূল কাঠামো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা যেই ভিত্তিমূলের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোর ব্যাপারে ইসলামের শাশ্বত দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সাথে পাশ্চাত্যের মোকাবিলায় মৌলিকভাবে করণীয় সম্পর্কে একটি উপসংহার যুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই লক্ষ করেছি, ইসলামের দৃষ্টিতে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে কোন হিসেবে নামকরণ করা যায় এবং ইসলাম সেই সমস্যার কী সমাধান দিয়েছে। ব্যাপারটা অনেকের কাছে অতি সরলীকরণ মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের মুক্তির পথ এখানেই নিহিত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ খুব সুন্দর বলেছেন, 'বিজয়ের জন্য প্রয়োজন পথপ্রদর্শক কিতাব এবং সাহায্যকারী তরবারি।'

এই বইকে মৌলিক বা অনুবাদ কিংবা সংকলন এককভাবে কোনোটাই বলা যায় না। কারণ এখানে তিন ধরনের লেখারই সংমিশ্রণ ঘটেছে। তবে বিন্যাসের দিক থেকে এক ধরনের মৌলিকত্ব রয়েছে। পাশ্চাত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে হাসান আসকারি রহিমাহুল্লাহর 'জাদিদিয়্যাত' বইটির অনুসরণ করা হয়েছে। ভূমিকা ও উপসংহার একেবারেই মৌলিক। মাঝখানের আলোচনাতে মৌলিক লেখার পাশাপাশি ড. জাবেদ আকবার আনসারী, ড. যাহিদ সিদ্দিকী মুগল এবং প্রফেসর মুফতি মুহাম্মদ আহমাদ- তাদের লেখা থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। এর মধ্যে ডক্টর মুগল সাহেবের 'ইসলামি ব্যাংকারি আওর জমহুরিয়্যত'[৩] ও 'মাকালাতে তাহজিবে মাগরিব' এবং মুফতি আহমাদ সাহেবের 'তাআরুফে তাহজিবে মাগরিব' উল্লেখযোগ্য।।

মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব অনেক বিস্তৃত। এমনকি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা আচরণ, কথাবার্তা ও কর্ম-কৌশলের সাথে পাশ্চাত্য চিন্তাচেতনার সংশ্লিষ্টতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বলা যায়,

---

[৩] বইটির প্রথম অংশ 'আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে লেখা। ইতিমধ্যে এই অংশটি ইলমহাউজ পাবলিকেশন থেকে 'ইসলামী ব্যাংক : ভুল প্রশ্নের ভুল উত্তর' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

খুবই ব্যাপক একটি বিষয়। তাই বিন্যাসের ক্ষেত্রে লেখা সংক্ষিপ্ত হলেও বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তিকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের মূল বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সাংঘর্ষিক অবস্থানকে তুলে ধরা হয়েছে। আর আলোচনার মাঝে মাঝে সংশ্লিষ্ট নানান বাংলা বইয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেন পাঠক এই বিষয়ে বিস্তারিত পড়াশোনা করার জন্য একটি ফুল প্যাকেজের সন্ধান পান।

বইটির পিছনে অনেক ভাইয়ের শ্রম ও সহযোগিতা রয়েছে। তাদের সবার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। বইটি যেন আল্লাহর কাছে মাকবুল হয়, উম্মাহর বিশুদ্ধ চিন্তা গঠনে সহায়ক হয় এবং একবিংশ শতাব্দীর জাহেলি সমাজকে ভেঙে ইসলামি সমাজ বিনির্মাণে সামান্য হলেও ভূমিকা রাখে- এটাই প্রত্যাশা। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের খেদমাত কবুল করে নিন। আমিন।

ইফতেখার সিফাত
২৯ জিলহজ ১৪৪১

সম্পাদকীয়

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা অতীতের বিভিন্ন সভ্যতার আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে কওমে আদ, সামুদ, সাবা এবং নিকট অতীতের রোম সভ্যতার আলোচনা উল্লেখযোগ্য। সমকালীন প্রেক্ষাপটে এসব সভ্যতার বেশ বাহ্যিক উন্নতি ছিল। তারা নিছক আমোদ-ফুর্তি বা যশ-খ্যাতির জন্যই বড় বড় ভবন নির্মাণ করত এবং তাদের যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা এতটাই উন্নত ছিল যে, তা দেখে মনে হতো তারা এর চেয়ে উন্নত কোনো শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু কুরআনুল কারিমে এসব সভ্যতা নিয়ে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা ছিল তাদের আকিদা-বিশ্বাসের স্বরূপ তুলে ধরা, বাহ্যত এতো উন্নতির পরেও যা তাদের ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তাই কুরআন খুবই গুরুত্বের সাথে তাদের আকিদা-বিশ্বাসগুলো তুলে ধরেছে। যে চিন্তাচেতনার উপর তাদের সভ্যতার ভিত রচিত হয়েছে, কুরআন সেগুলো বিস্তর বর্ণনা করেছে।

আলোচিত সভ্যতাগুলো মৌলিকভাবে সৃষ্টি, স্রষ্টা, জীবন-জগতের শুরু-শেষ, মানুষের পুনরুত্থান ও বিচারদিবস এসব বিষয়ে অবিশ্বাসী ছিল। তারা মনে করত এই বিশাল জগত কারো সৃষ্টি নয়, এগুলো ঘটনাক্রম এবং জীবনমাত্র একটাই। এই ইহজগতের পর আর কোনো জীবন নাই, যেখানে মানুষ কোনো প্রতিপত্তিশালী স্রষ্টার সামনে হিসাবের সম্মুখীন হবে। তারা বলত- আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। 'আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা (কখনো) পুনরুত্থিত হবো না' (মুমিনুন-৩৭)। তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পরিবর্তে তাদের মধ্যে যারা দীনে হকের চরম বিরোধী ও উদ্ধত চরিত্রের অধিকারী ছিল, তাদের আদেশ-নিষেধই পালন করত। '(তারা) উদ্ধত বিরোধীদের আদেশ পালন করেছে' (হুদ-৫৯)। ফলে তাদের ধ্বংস ছিল অনিবার্য। 'অতঃপর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে তারা সকালবেলায় নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল' (আরাফ-৭৮)।

এই অবিশ্বাস তাদের এতটাই স্বেচ্ছাচারিতার প্রণোদনা দিয়েছিল যে, তারা এক সীমাহীন অনৈতিক সমাজ গড়ে তুলেছিল। সেখানে সত্য ও নৈতিকতার প্রতি আহ্বানকারীদের বলা হতো গোঁড়া ও সেকেলে। ঠাট্টা করা হতো এই বলে যে, 'তুমি তো দেখছি বিরাট সাধু' (আরাফ ৮২)! সত্য ও মিথ্যা, ভালো-মন্দ ও পাপ-পুণ্য নির্ধারণ করত তাদের মন, তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ফলে তারা একেকজন হয়ে উঠেছিল চিন্তায় আল্লাহর দাসত্বমুক্ত এক সত্তা। নিজেরাই হয়ে উঠেছিল নিজেদের রব।

যেকোনো সভ্যতার বুনিয়াদ হলো আকিদা ও ধর্মবিশ্বাস। এবং সমস্ত সভ্যতাই তা ছোট হোক বা বড়, দীর্ঘমেয়াদি হোক বা স্বল্পমেয়াদি, তা গড়ে ওঠে একটি বিশ্বাসগত কাঠামোর উপর। কোনো সভ্যতার আকিদা-বিশ্বাস যদি গভীর থেকে উপলব্ধি করা যায়, তা হলে দূর থেকেও খুব সহজেই সে জাতির জীবনের ছক পূরণ করা যায়। তাই কোনো সভ্যতা তা বাহ্যত যতই উন্নত হোক, তার মূল্যায়ন হবে তার আকিদা-বিশ্বাস দিয়ে। কুরআন অতীতের সভ্যতাগুলোকে এভাবেই মূল্যায়ন করেছে। যাতে কুরআনের অনুসারীরা কোনো আধুনিক সভ্যতার বাহ্যত উন্নতি ও অন্তরীণ বিজয় দেখে নিজেদের প্রতারিত না করে; বরং যেন তার হাকিকত সম্পর্কে খোঁজ নেয়, সভ্যতাকে বোঝে এবং সে বিষয়ে ঈমানি দিক থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

স্পেনে মুসলিমদের পতনের পর পর্যায়ক্রমে নানা আন্দোলন ও সংস্কার পাড়ি দিয়ে বিগত কয়েক শতক থেকে ইউরোপ-আমেরিকার যৌথ আকিদা-বিশ্বাস, পরস্পর অর্থায়ন ও সাংস্কৃতিক মিলনের বদৌলতে যে নতুন সভ্যতার সৃষ্টি ও জয়জয়কার হয়েছে, আমরা একে পশ্চিমা সভ্যতা বলে জানি। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, ইসলামের পর মানুষের জীবনে প্রভাব সৃষ্টিকারী এমন জাদুকরী কোনো সভ্যতার জন্ম হয়নি। হিউম্যান বিয়িং তথা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক এই জীবনব্যবস্থা বা সভ্যতার প্রধান আকর্ষণ হলো এর সহজতা এবং রাষ্ট্রকর্তৃক ব্যক্তিকে তার সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বেচ্ছাচারিতার অনুমোদন দেওয়া। মানুষের জন্য এরকম সহজ ও সাধারণ ভিত্তি, এবং মানুষের সকল প্রকার চাহিদা পূরণকারী দ্বিতীয় কোনো সভ্যতা নেই। এতে কোনো গভীরতা, কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি এবং কোনো ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রয়োজন নেই। তাই সাধারণ

মানুষের নিকট এটি খুবই আকর্ষণীয় এবং মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এর চেয়ে অধিক পৌন:পুনিক জয়লাভকারী কোনো সভ্যতা বা জীবনব্যবস্থা দেখা যায়নি।

এই সভ্যতা তার উত্থান ও বিজয়কালে গভীর থেকে মুসলিমদের প্রভাবিত করে। তাদের সমস্ত চেতনা, দীনি আদর্শ ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে পরাজিত করবার চেষ্টা চালায়। অনেক ক্ষেত্রে তা সফলও হয়। বিশেষত আজ পশ্চিমা সভ্যতা মুসলিম-মানসে সত্য, মিথ্যা ও নৈতিকতার এমন মানদণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে যে এর বিকল্প ভাবাকে মনে করা হয় অপরাধ। এর ফল এই দাঁড়ায় যে, পশ্চিমা সভ্যতার বাহ্যিক আয়োজনের সাথে সাথে তাদের আকিদা-বিশ্বাসগুলোও আজ মুসলিম-মানস দখল করে নিয়েছে। প্রায় প্রতিটি কাঁচা-পাকা ঘরই এই সভ্যতার প্রতীক বা সিম্বলে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতার দর্শন ও আদর্শগত প্রভাবে দীর্ঘদিন থেকেই ইসলামি পৃথিবীর সামনে নতুন এক ইরতিদাদের সয়লাব ঘটেছে, যা ব্যাপকতা ও গভীরতার দিক থেকে এ যাবতকালের সমস্ত ইরতিদাদি ফেতনাকে ছাড়িয়ে গেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- এই সভ্যতা আলাদা ধর্মের দাবি না করেও গোপনে একটি নতুন ধর্মের স্থান দখল করে নিয়েছে, যাকে নির্ভুল, অকাট্য, অলঙ্ঘনীয় ভাবা হয়। এই সভ্যতার কোনো একক প্রতীক নেই। তবে এর অনেকগুলো মোহনীয় পরিভাষা আছে, আছে ইতিহাসও। আবার এই সভ্যতা থেকেই তৈরি হয়েছে অনেক ইরতিদাদি মতবাদ। তাই এই সভ্যতাকে জানা এবং এর পরিধি হাতে-কলমে বুঝা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ছিল একান্ত কর্তব্য। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এ বিষয়ে সচেতন মুসলিম সমাজেরও খুব একটা দৃষ্টি পড়েনি।

মুহতারাম ইফতেখার সিফাত এই বইয়ে পশ্চিমা সভ্যতার ভেতর-বাহির নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাদের আকিদা, বিশ্বাস, দর্শন, পরিভাষাগত জটিলতা এবং ইতিহাস ও তার উৎসগুলো বেশ চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। পশ্চিমা সভ্যতার বুনিয়াদি বিশ্বাস কেন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সে বিষয়ে দলিল পেশ করেছেন দীনে ইলমের উৎস ও বাস্তবতার নিরিখে। একইসাথে তিনি পশ্চিমা সভ্যতার ভিত হিউম্যান বিয়িং ও তার ইতিহাস থেকে জন্ম নেওয়া স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতির

স্বরূপ ও এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। দেখিয়েছেন এই সভ্যতার মানবিক হয়ে ওঠার পেছনের অসারতাগুলো। তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে পশ্চিমা সভ্যতার বেঁধে দেওয়া মানদণ্ডকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে সব কিছুকে মূল্যায়ন করার; বিশেষত ইসলামের আহকাম ও বিধানকে মূল্যায়ন করার যে প্রবণতা তাকে চিহ্নিত করেছেন। খুব গভীর থেকে দেখিয়েছেন কীভাবে একটি মুসলিম-মানস পশ্চিমা সভ্যতা দ্বারা প্রতারিত হয় এবং আখেরে নিজের ঈমান আমল হারিয়ে বসে। পাশাপাশি হাজারো বাহ্যিক উন্নতির পরেও বিশ্বাস ও বিকৃতির ফলে একটি সভ্যতা কীভাবে মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় সে দিক নিয়েও পেশ করেছেন গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা।

পশ্চিমা সভ্যতাকে বুঝার জন্য নানা দিক থেকে কাজ হলেও পুরো বিষয়টাকে একসাথে এত সুন্দর উপস্থাপনাকে বিরলই বলতে হবে। আশা করছি বাংলাভাষী পাঠকের জন্য বইটি খুবই উপকারী হবে। বিশেষত যারা বুদ্ধিবৃত্তিক দাওয়াতের ময়দানে কাজ করেন এবং সমাজের নানা আঙ্গিক, সময়ের স্রোত ও আধুনিক চিন্তার নামে বহমান ইরতিদাদের ফেতনা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাদের জন্য। আল্লাহ আমাদের এই ইরতিদাদি সভ্যতা থেকে বাঁচার তাওফিক দিন। লেখক ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন। এ বইকে মানুষের হেদায়েতের অসিলা বানান। আমিন।

মুহাম্মাদ আফসার

সূচিপত্র

হিউম্যান বিয়িং

শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব

ভূমিকা

এক

ইসমাহ বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাচ্যের ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, পাশ্চাত্যের ফেতনা কেমন হবে? তিনি বললেন, তা তো হবে আরো অধিক ভয়ংকর।[৪]

উল্লিখিত হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশ্চিমের যেই ভয়ংকর ফেতনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, হতে পারে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাই সেই ফেতনা। তবে আল্লামা ইউসুফ বানুরি রহিমাহুল্লাহ হাদিসে উল্লেখিত পশ্চিমের ফেতনা বলতে মুসতাশরিকদের[৫] ফেতনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ এটা একটা পশ্চিমা ইলমি ফেতনা, যার প্রভাবে আজ পৃথিবী ইরতিদাদ ও ইলহাদে[৬] সয়লাব হয়ে গেছে।[৭]

---

[৪] মু'জামে তাবারানি, হাদিস নং ৫০১; হাইসামি রহ. বলেছেন বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

[৫] মুসতাশরিক মানে প্রাচ্যবিদ। ইংরেজি ভাষায় ওরিয়েন্টিলিস্ট বলা হয়। প্রাচ্যবিদ তাদেরকে বলে, যারা প্রাচ্যবাদের চর্চা করে। আর প্রাচ্যবাদ মূলত একটি পশ্চিমা আইডোলজি। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামসংক্রান্ত পূর্বপরিকল্পিত কিছু ধ্যানধারণার প্রচার করা। তা ইসলামি শিক্ষার সাথে মিলতেও পারে আবার নাও মিলতে পারে।

প্রাচ্যবাদ-গবেষক এডওয়ার্ড সাঈদ বলেন, 'প্রাচ্যবিদ্যা বলতে আমরা এটাও বুঝে নিতে পারি যে, এটা হচ্ছে পাঠসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা লাভের জন্য পাশ্চাত্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি বোর্ড। এই বোর্ডের কাজ হচ্ছে প্রাচ্যের লোকদের সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করা। তাদের করণীয় নির্ধারণ করে দেওয়া। তাদের মাইন্ড কন্ট্রোল করা। তাদের উপর নিজেদের মানসিক আধিপত্য চাপিয়ে দেওয়া।'

(প্রাচ্যবাদ সম্পর্কে জানতে আল্লামা মুস্তফা সিবায়ী রহ. এর 'আল-ইসতিশরাক ওয়াল মুসতাশরিকুন' বইটি পড়া যেতে পারে। পাশাপাশি এডওয়ার্ড সাঈদের 'ওরিয়েন্টালিজম' বইটিও পড়া উপকারী হবে।)

[৬] জরুরিয়াতে দীনের স্বতঃসিদ্ধ ব্যাখ্যা পরিবর্তন করে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা করে কুফুরের দিকে পরিচালিত করা কিংবা কোনো কুফুরকে ইসলামি করার অপচেষ্টাকে ইলহাদ বলে। (ইকফারুল মুলহিদীন)

[৭] দাওরে হাজের কে ফেতনে, পৃষ্ঠা-৯৮

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশ্চিমের ফেতনাকে খুবই ভয়াবহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা কতটা ভয়ংকর এবং এটার আর কী কী পরিচয় হতে পারে, সামনে অগ্রসর হলে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিতে পরিষ্কার হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

দুই

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষজামানার বিভিন্ন ফেতনার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করেছেন। হাদিসের প্রতিটি মৌলিক গ্রন্থেই 'কিতাবুল ফিতান' নামে অধ্যায় রয়েছে। সেসব অধ্যায়ে ফেতনার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ফেতনা হিসেবে যাকে চিহ্নিত করা হয়, তা হলো দাজ্জালের ফেতনা। এই ফেতনার ভয়াবহতার বর্ণনা দিতে গেলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-সহ উপস্থিত সাহাবিদের চেহারা লাল হয়ে যেত এবং কলিজা শুকিয়ে যেত। উম্মতকে এই ফেতনা থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি সর্বপ্রকার উপায়-উপকরণ সুস্পষ্টরূপে বাতলে দিয়েছেন এবং বিভিন্ন আমল সম্পাদনসহ আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

মুসলিম উম্মাহর জন্য সত্তাগত দিক থেকে দাজ্জাল একটি ভয়াবহ ফেতনা। তবে দাজ্জালি ফেতনা শুধুই তার সত্তার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। দাজ্জালের আগমনের পর তার ক্ষমতা মুমিনদের সবচেয়ে বেশি ফেতনায় ফেলবে (দাজ্জালের ক্ষমতার নানা ব্যাখ্যা থাকতে পারে, তার আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য না)। কিন্তু দাজ্জালের আগমনের পূর্বে দাজ্জালি সভ্যতা মুমিনদের গ্রাস করতে থাকবে।[৮] দাজ্জালি ফেতনার বেড়াজালে পড়েই অনেক মুসলিম দাজ্জালের জন্য অপেক্ষমাণ জাতির সাথে দাজ্জালের মঞ্চ প্রস্তুতির কাজ করবে এবং তার দলের সদস্যপদ গ্রহণ করে নেবে।

বলতে গেলে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাই দাজ্জালের জন্য মঞ্চ প্রস্তুতকারী সেই দাজ্জালি ফেতনা। ড. ইসরার আহমাদসহ অনেক ইসলামি স্কলার

---

[৮] দাজ্জালি সভ্যতা বলার কারণ দাজ্জাল যেসব ভেল্কিবাজির মাধ্যমে মুমিনদের ফেতনায় ফেলবে পশ্চিমা সভ্যতায় সেগুলো পূর্ণ অর্থে বিদ্যমান। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে হাদিসে বর্ণিত দাজ্জাল একটি শরীরী ফেতনা।

এমন মত ব্যক্ত করেছেন। ইসরার আহমাদ প্রণীত 'মুসলমান উম্মাতুঁ কা মাজি, হাল আওর মুসতাকবাল' গ্রন্থে এই দাবির খুব সূক্ষ্ম একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আমরা জানি দাজ্জালের একনিষ্ঠ এবং প্রধান সহচর হবে ইহুদিসম্প্রদায়। মৌলিকভাবে বর্তমান বিশ্বে তারাই দাজ্জালের মঞ্চ তৈরি করছে। এই কাজে তারা খুব সচেতনভাবেই খ্রিষ্টান সমাজকে ব্যবহার করছে।

এক সময় খ্রিষ্টানরা ছিল ইহুদিদের চরম শত্রু। খ্রিষ্টানরা তখন ইহুদিদের উপর সর্বপ্রকার নিপীড়ন ও লাঞ্ছনাকর কর্মকাণ্ড চালাত। কিন্তু একপর্যায়ে ইহুদিরা তৎকালীন বিজ্ঞানের রাজধানী ইউরোপের মুসলিম শাসনাধীন স্পেনকে খ্রিষ্টানদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করল। তারা কর্ডোভা ও গ্রানাডার ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত উপকরণ ইউরোপে ছড়িয়ে দিল[৯] এবং সেই সাথে বিজ্ঞান-শিক্ষায় মিশিয়ে দিল ধর্মহীনতার বিষ। ফলে একপর্যায়ে পুরো ইউরোপের আপাত-ধার্মিক চরিত্র ও ধর্মীয় নৈতিকতা গায়েব হয়ে গেল। এরপর রেনেসাঁ,[১০] এনলাইটেনমেন্ট[১১] এবং প্রোটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশন আন্দোলনের[১২] মাধ্যমে পোপ ও গির্জার ক্ষমতায়নকে নিঃশেষ করে দিয়ে খ্রিষ্টান সমাজের উপর

---

[৯] islam in Europe: Jack Goody

[১০] ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে ইউরোপে এক বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে, যা মূলত 'খ্রিষ্টবাদপূর্ব' ইউরোপীয় চিন্তাচেতনা ও কালচারে ফিরে যাবার আন্দোলন। একে বলা হয় 'রেনেসাঁ' বা নবজন্ম। ক্ল্যাসিকাল (প্রাচীন গ্রিক-রোমান সভ্যতার) ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধ চর্চার প্রবণতা শুরু হয় এর মাধ্যমে।
(https://www.britannica.com/event/Renaissance)

[১১] Enlightenment হলো ১৭শ ও ১৮শ শতকে ইউরোপের এক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন। এর ফলে ঈশ্বর, যুক্তি, প্রকৃতি এবং মানবতার ধারণা নতুনভাবে তৈরি হয়, যার সম্মিলনে গড়ে ওঠে এক নতুন worldview বা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত পশ্চিমে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং শিল্প-দর্শন-রাজনীতির ছাঁচ গড়ে দেয়। এই চিন্তাধারার কেন্দ্র হচ্ছে যুক্তির প্রয়োগ। আর মানুষের মূল লক্ষ্য এখানে— জ্ঞান, স্বাধীনতা আর সুখ।
(https://www.britannica.com/event/Enlightenment-European-history)

[১২] ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ১৫১৭ সালে মার্টিন লুথার লেখেন Ninety-five Theses, যা থেকে জন্ম নেয় 'প্রোটেস্ট্যান্ট' আন্দোলন। একে প্রোটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশন বা শুধু 'রিফর্মেশন'ও বলে। মার্টিন লুথারকে বলা হয় প্রোটেস্ট্যান্টবাদের প্রবক্তা।
Bandler, Gerhard. "Martin Luther: Theology and Revolution." Trans., Foster Jr., Claude R. New York: Oxford University Press, 1991.

নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠার পথ উন্মোচন করল। এখানে বলে রাখা ভালো যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐতিহাসিক ধারায় পেছনের খলনায়ক ছিল ইহুদিজাতি। ফলে স্বাভাবিক ইতিহাসের বর্ণনায় বিষয়টি পরিষ্কারভাবে সামনে আসবে না।

খ্রিষ্টান সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন ও কর্তৃত্বের অনুপস্থিতির ফলে ইহুদিরা বিভিন্ন খ্রিষ্টান রাষ্ট্রে আইনিভাবে সুদি কারবারের অনুমোদন নিয়ে নেয়। অথচ ইতোপূর্বে খ্রিষ্টান সমাজেও সুদ নিষিদ্ধ ছিল। এর মাধ্যমে ইহুদিরা সুদভিত্তিক এমন এক অর্থব্যবস্থার গোড়াপত্তন করে, যা ধীরে ধীরে পুরো বিশ্বকে অর্থনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণে নিতে থাকে। যার প্রধান ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান হলো ব্যাংক এবং আধুনিক কারেন্সি সিস্টেম। একদিকে তারা আদর্শ ও নৈতিকতা বিনষ্টের জাল ছড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে সুদি অর্থব্যবস্থার ফাঁদে ফেলে প্রথমে পুরো ইউরোপে খ্রিষ্টানদের উপর এক অদৃশ্য ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। এরপর ইউরোপ থেকে ঔপনিবেশের মাধ্যমে প্রাচ্যে এসে খ্রিষ্টান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বলা যায়, ইহুদিরা হলো বর্তমান আধুনিক সভ্যতার মুকুটহীন সম্রাট।[১৩]

এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, পাশ্চাত্য সভ্যতা কিংবা পুঁজিবাদী বিশ্বের পৃষ্ঠপোষকদের চেনা আর তারা হলো ইহুদি। এভাবে ইউরোপ ও সেখান থেকে বিশ্বব্যাপী নানান আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে (মিডিয়া যার প্রধান হাতিয়ার) তারা সর্বত্র সাপ্লাই করছে পাশ্চাত্য দর্শন। সামরিক এবং অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে তারা এর ভিত রচনা করে মুসলিমদেশগুলোতে। এরপর সেই ঔপনিবেশিকতার প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে মানুষের মননে, মগজে। ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলকেন্দ্রে থেকে যারা ভূমিকা রেখে আসছে, তারা হলো ইহুদিজাতি। আর খ্রিষ্টানরা হলো তাদের দ্বারা ব্যবহৃত জাতি। হাদিসের বক্তব্য অনুযায়ী দাজ্জালের প্রধান সহচর হবে ইহুদিজাতি। দাজ্জালকে তারা 'গড' বলে বিশ্বাস করে। সুতরাং বলা যায়, পাশ্চাত্য সভ্যতা হলো দাজ্জালের বার্তাবাহী দাজ্জালি ফেতনা। কারণ এই ফেতনা তাদের মাধ্যমেই পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে, যারা ভবিষ্যতে হবে তার সহযোগী, সহযোদ্ধা।

---

[১৩] সাবেকা আওর মওজুদা মুসলমান উম্মাতুঁ কা মাজি, হাল আওর মুসতাকবাল, ৫৬-৫৮; ড. ইসরার আহমাদ

মাওলানা আবুল হাসান আলি নদবি রহিমাহুল্লাহও বর্তমান পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতাকে দাজ্জালি সভ্যতা মনে করতেন। এ ব্যাপারে তিনি হজরত মানাজির আহসান গিলানি রহিমাহুল্লাহর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। সাথে সাথে তিনিও মনে করতেন, এই সভ্যতার মূলে রয়েছে ইহুদিজাতি। যারা খ্রিষ্টানদের সঙ্গে হাতে হাত রেখে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আধুনিক ভোগবাদী দাজ্জালি সভ্যতা সজ্জিত করছে। এ ব্যাপারে তিনি 'ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত' বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ইহুদিদের হাত ধরেই বর্তমান সভ্যতা আধুনিকতার চরম শিখরে উঠে দাঁড়িয়েছে। ইহুদিদের থেকেই 'দাজ্জালে আকবার' আত্মপ্রকাশ করবে, যে কুফুর ও নাস্তিকতায়, মিথ্যাচার ও ধোঁকাবাজিতে সব দাজ্জালের নেতা ও প্রধান হবে।[১৪]

তিন

সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. এর মতে পাশ্চাত্য সভ্যতা হলো নতুন ইরতিদাদ। ইসলামি মতাদর্শ ত্যাগ করে অন্য মতাদর্শ গ্রহণ করা। অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে যাওয়া। ইসলামি ইতিহাসে দুইবার বৃহত্তর পরিসরে ইরতিদাদের ঘটনা ঘটে। সবচেয়ে বড় এবং মারাত্মক ইরতিদাদের ঘটনাটি ঘটেছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পরপর আরবের সীমান্তবর্তী গোত্রগুলোতে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তখন মুসলিমবিশ্বের খলিফা। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এই ফেতনা দমন করেছিলেন। দ্বিতীয় বৃহত্তর ইরতিদাদের ঘটনাটি ছিল স্পেনে মুসলমানদের পরাজয়ের পর। সেখান থেকে বহিষ্কৃত মুসলিমদের মাঝে ইরতিদাদের ফেতনা মহামারির আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর বাইরে ইসলামি ইতিহাসে ইরতিদাদের বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা পাওয়া যায়।

কিন্তু অতীতে যখনই কোনো ইরতিদাদের ঘটনা ঘটেছে, মুসলিম সমাজে তাৎক্ষণিক দুটি প্রতিক্রিয়া অবশ্যই দেখা গেছে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে মারাত্মক বিদ্বেষ ও অনীহা এবং ইসলামি সমাজের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ। ইরতিদাদের ঘটনার প্রতিবিধানে ইসলামি-সমাজের এই অবস্থা ছিল আবশ্যিক। কিন্তু শতাব্দীকাল যাবৎ ইসলামি-দুনিয়ায় এমন এক

[১৪] ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত, ৩৩

ইরতিদাদের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে, যার বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। এটা শক্তি, ব্যাপকতা ও গভীরতার দিক থেকে ইতিহাসের সমস্ত ইরতিদাদের আন্দোলনকে ছাড়িয়ে গেছে।

ইউরোপ থেকে যে দর্শন ও সভ্যতা ইসলামিবিশ্বে অনুপ্রবেশ করেছে, তার মূল বক্তব্যই হলো ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও বিষয়াবলি অস্বীকার করা। পাশ্চাত্য সভ্যতা একটি স্বতন্ত্র বিশ্বাস। একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। এটা তার মৌলিকত্ব, ব্যাপকতা, সর্বজনীনতা এবং মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিকৃত ও বশীভূত করার ক্ষেত্রে ইসলামের পর জন্ম নেওয়া সবচেয়ে বড় এবং ভয়ংকর ধর্ম। বর্তমানে যেই শ্রেণির হাতে মুসলিমদেশগুলোর ক্ষমতা রয়েছে, তাদের প্রায় সকলেই এই নতুন ধর্মের অনুসারী। কারো বিশ্বাস হালকা আর কারোটা মজবুত। তবে সবাই এই ধর্মে বিশ্বাসী। মুসলমানদের প্রতিটি ঘর ও পরিবার এই ইরতিদাদের আক্রমণের শিকার। কলেজ-ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে শিল্প-সাহিত্য, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় অঙ্গনসহ সবকিছুর উপর এর আগ্রাসী থাবা বিস্তৃত হয়েছে। আপনি যখনই কারো সাথে একান্তে আলাপ করে তার মনের কথা বের করবেন, আশ্চর্যের সাথে দেখবেন তার চিন্তাচেতনায় পাশ্চাত্য সভ্যতার ছাপ রয়েছে। বিরাট একটা শ্রেণি তো প্রকাশ্যেই এর অনুসরণ ও স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। তাদের সাথে একান্ত আলাপে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো শতাব্দীকালব্যাপী চলমান এই নতুন ইরতিদাদ ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছে নিঃসন্দেহে; কিন্তু এই ইরতিদাদের কোনো প্রতীক নেই। এই ইরতিদাদে আক্রান্ত ব্যক্তি গির্জায় যায় না। মন্দিরে যায় না। সে নিজের ধর্ম ত্যাগের ঘোষণাও দেয় না এবং সমাজও এই ব্যাপারে সচেতন নয়। উম্মাহর আলেমগণও এর জন্য অত অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা অনুভব করতে পারছেন না। বরং তাদের কেউ কেউ চেতনে কিংবা অবচেতনে এই ইরতিদাদকে আদর্শিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং একে ইসলামিকরণের চেষ্টায় লিপ্ত আছেন। ফলে ইতিহাসের সেই আবশ্যিক ফল আর দেখা যায় না, যা ইরতিদাদের সময় উম্মতের আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গ্রহণ করেছিলেন। এই নব্য ইরতিদাদকে সমূলে বিনাশ করার পরিবর্তে এখন সাদরে গ্রহণ করা হচ্ছে। এর মাঝেই খোঁজা

হচ্ছে উম্মতের মুক্তির পথ। ফলে মাওলানা আবুল হাসান আলি নদবি রহিমাহুল্লাহর মতো আফসোস করে বলতেই হয়,

رِدَّةٌ وَلَا اَبَا بَكْرٍ لَهَا

> ইরতিদাদের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে; কিন্তু আবু বকরের মতো কেউ নেই, যে তার টুটি চেপে ধরবে।[১৫]

চার

এক সময় মানুষ গ্রিকদর্শনে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের ব্যাপারে বিভিন্ন আপত্তি তুলতো। ইসলামি ইতিহাসে মুসলিমদের মাঝে একটি ভ্রান্ত দলের উৎপত্তি এই গ্রিকদর্শনের প্রভাবে হয়েছে। তাদেরকে আমরা মুতাজিলা হিসেবে চিনি। আকল তাদের কাছে ছিল সবকিছুর মাপকাঠি এবং একমাত্র বিচারক। যুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে তারা ইসলাম, নবী-রাসুল এমনকি আল্লাহকে পর্যন্ত বিচার করত। প্রশ্ন তুলে নাকচ করত অকাট্য শরয়ি নুসুস দ্বারা প্রমাণিত অনেক বিশ্বাস ও কর্ম। ইমাম গাজালির মতো ব্যক্তিরা উক্ত ফেতনার মোকাবিলা করেছেন। অনেক কালজয়ী খেদমতের মাধ্যমে তারা মুসলিম সমাজ থেকে গ্রিক-সভ্যতার প্রভাব নির্মূল করেছেন। গ্রিকদর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মুতাজিলাদের নানান বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ইমামগণ লড়াই করে গেছেন। কেউ কেউ জীবন পর্যন্ত দিয়েছেন। এদের মধ্যে ইমাম আহমাদ বিন হামবল রহ. অন্যতম। আল্লাহ, তাদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

প্রাচীন সেই গ্রিক-সভ্যতার আধুনিক ও বিবর্তিত ভার্সন হলো বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তার আনুকূল্যে প্রচারিত দর্শন।[১৬] আর এই সভ্যতায় আক্রান্ত নব্য মুতাজিলা সৃষ্টি হচ্ছে মুসলিমদের ঘরে ঘরে। নব্য ইতিজাল আচ্ছন্ন করে নিচ্ছে বিভিন্ন ধর্মীয় অঙ্গনকেও। আধুনিক যুগ থেকে শুরু করে উত্তর আধুনিককাল পর্যন্ত ইসলামের উপর যত অভিযোগ এসেছে,

---

[১৫] ইলাল ইসলামি মিন জাদিদ, ১৭১; সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.।

[১৬] ইউরোপে চিন্তাধারার যে পরিবর্তন শুরু, তাই 'রেনেসাঁ'। তার সংজ্ঞাই হলো ক্ল্যাসিকালে ফিরে যাওয়া। ক্ল্যাসিকাল মানে হলো খ্রিষ্টবাদের আগের গ্রেকো-রোমান সভ্যতা-দর্শন-সংস্কৃতি, যা ইউরোপের নিজস্ব ক্ল্যাসিক; খ্রিষ্টবাদ ইউরোপের বাইরের জিনিস। সে হিসেবে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা নিঃসন্দেহে গ্রেকো-রোমান সভ্যতার সন্তান।

তার সবই এসেছে পশ্চিমা দুনিয়া থেকে কিংবা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষজনের কাছ থেকে। তাদের আপত্তিগুলোর গভীরে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে প্রায় সবার ভিত্তিই পাশ্চাত্য সভ্যতার নির্দিষ্ট কিছু নীতির উপর। স্বাধীনতা, সমতা, উন্নতি ও বিজ্ঞান। স্পষ্টতই এগুলোর পাশ্চাত্য ব্যাখ্যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে এগুলোর ভিত্তিতে যেসব আপত্তি তোলা হয়, তারও কোনো ভেল্যু নেই মুসলিমদের কাছে। মুসলিমদের ভালো করে বুঝতে হবে, ইসলামকে জাস্টিফাই করার জন্য বাইবেল যেমন কোনো মাপকাঠি হতে পারে না, তেমনি পাশ্চাত্য দর্শন ও আদর্শের ভিত্তিতেও ইসলামকে জাস্টিফাই করা যাবে না। যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার প্রদত্ত ওহিকে দীনে ইসলামের মূল সূত্র বানিয়েছেন, যা মানবীয় জ্ঞানের অনেক ঊর্ধ্বে, তখন বিজ্ঞান কিংবা অন্য কোনো মাপকাঠি দিয়ে ইসলামি বিধানের ব্যাপারে ভালো-মন্দের সিদ্ধান্ত দেওয়া অবান্তর। বরং বলতে হবে ইসলামই একমাত্র সঠিক ধর্ম। ইসলামের বাইরে পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যার মাধ্যমে ইসলামকে বিচার করা যাবে।

মূলত বর্তমান সময়ে ইসলামের উপর যত অভিযোগ রয়েছে, তার সবকটির ভিত্তিই অসার এবং ত্রুটিপূর্ণ। এসব ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলামের সুবিশাল প্রাসাদে দৃষ্টিপাত করলে নানান অসঙ্গতি মনে হতেই পারে। এর দায়ভার ইসলামের উপর নয়; বরং সংশ্লিষ্ট মাপকাঠিই আসল সমস্যা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, এই পরিস্থিতিতে আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অবস্থান সঠিক প্রমাণ করার জন্য এবং হাজারো আপত্তি থেকে বাঁচার জন্য সেই ভুল মাপকাঠির ভিত্তিতেই জবাব দেওয়া শুরু করে, যেন তারা সেসব মাপকাঠিকে সঠিক এবং প্রশ্নের ঊর্ধ্বে মনে করে। এই পদ্ধতি এক দিকে হাজারো নতুন আপত্তির জন্ম দেয় অন্যদিকে এই মাপকাঠিকে মানুষের মাঝে সঠিক, সন্দেহাতীত ও প্রশ্নাতীত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

উদাহরণস্বরূপ, সমতাকে (equality) যদি আমরা কোনো কিছু জাজ করার মূলনীতি মেনে নিই, তা হলে প্রশ্ন আসবে নারী-পুরুষের সমতা নিয়ে, মুসলিম-অমুসলিমের সমতা নিয়ে।

এই আপত্তিগুলো তখনই ধর্তব্য হবে যখন আমরা সমতাকে ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করব। কিন্তু আমরা যদি এই মাপকাঠিই প্রত্যাখ্যান করি এবং একে প্রশ্নের সম্মুখীন করি তা হলে এসব আপত্তির সুযোগই থাকবে না। প্রশ্ন হতে পারে, আমাদের সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ তো কুরআন-সুন্নাহকে মানদণ্ড হিসেবে মানে না। এজন্য তার মাপকাঠিতে এসে তাকে দলিল দিতে হবে, যাতে করে আমাদের ধর্মের সত্যতা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় এবং সে তার মাপকাঠিতে আমাদের ধর্মের শুদ্ধতা যাচাই করতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে উলটো আরেকটি প্রশ্ন রাখতে চাই। একজন মুসলমান এবং খ্রিষ্টানের মাঝে মৌলিক পার্থক্য কী? হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইহুদিদের থেকে মুসলমানদের কেন ভিন্ন মনে করা হয়? নিশ্চিতভাবেই এর উত্তর হবে, তারা সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দ যাচাই করার জন্য বেদ-বাইবেল-ত্রিপিটকের মতো নিজস্ব ধর্মীয় গ্রন্থকে ব্যবহার করে। আর মুসলমানরা শুদ্ধ-অশুদ্ধ ও বৈধ-অবৈধ সবকিছুর মাপকাঠি হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহকে গ্রহণ করে। এমনিভাবে লিবারেল ও সেক্যুলাররা মানবীয় জ্ঞানকে সবকিছুর মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে। মাপকাঠির ভিন্নতার ফলেই তারা আলাদা শ্রেণি, আলাদা জাতি।

এখন কেউ যদি কিছুক্ষণের জন্যও ইসলামি শরিয়াহকে প্রমাণ করার জন্য বাইবেল কিংবা বেদকে মাপকাঠি মানে এবং এর মাধ্যমে ইসলামের কোনো বিধান প্রমাণও করে ফেলে তা হলে এর সর্বশেষ ফল হলো একটা কুফুরি মাপকাঠি সমাজে প্রতিষ্ঠা করা। এর মাধ্যমে সবশেষে কুফুরেরই বিজয় হবে।

কোনো মুসলমান যদি কুরআন-সুন্নাহর দলিলকে যথেষ্ট মনে করে এবং সাইন্টিফিক ব্যাখ্যারও প্রয়োজন মনে করে, তা হলে এমন ব্যক্তিকে শরিয়ত বুঝানোর আগে তার ঈমানের উপর মেহনত করা জরুরি। বর্তমানে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর দলিল থাকা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খোঁজার প্রবণতা দেখা যায়। কুরআন-সুন্নাহর দলিলকে যথেষ্ট ও যথার্থ মনে না করার প্রবণতা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোথাও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উল্লেখের প্রয়োজন থাকলেও এই সময়ে ব্যাপকভাবে এর চর্চা ভালো ফল বয়ে আনবে না। আমাদের পরাজিত মানসিকতার এমন পতন ও পচনমুখী অবস্থাকে অবশ্যই বিবেচনায়

রাখতে হবে, যেন উক্ত ব্যাখ্যাকেই বিধান গ্রহণের একমাত্র কারণ ভাবতে শুরু না করি। চূড়ান্ত কথা হলো, ইসলামের সমস্ত বিধান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে ওহির মাধ্যমেই প্রমাণিত। এগুলোর অনেক কিছুই মানবীয় জ্ঞান-সীমানার বাইরের বিষয়। আহলে ইলমদের দায়িত্ব হলো, সাধারণ মানুষের মাঝে এই অনুভূতি প্রবল করা যে, অমুক বিধান এমন হওয়ার একমাত্র কারণ আল্লাহর হুকুম। যদি ইসলামি শরিয়াহর মাপকাঠি একমাত্র কুরআন-সুন্নাহকে মানা হয় এবং অন্য সমস্ত সভ্যতা ও দর্শনকে মূলনীতি হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা হয়, তা হলে ইসলামের ব্যাপারে কোনো আপত্তিই থাকবে না।

পাঁচ

আদর্শিকভাবে মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি নাস্তিকতা নয়; বরং পাশ্চাত্য সভ্যতা। নাস্তিকতা এর একটি ছোট্ট অংশ মাত্র। পাশ্চাত্যের মূল সংঘর্ষ স্রষ্টা কিংবা ধর্ম অস্বীকার করা নয়; বরং আল্লাহ ও তার দীনের বিশ্বাস ও বাস্তব ক্ষমতা খর্ব করা। অস্বীকারের বিষয়টা গৌণ; মৌলিক নয়। কেউ করতে পারে আবার নাও করতে পারে। অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতায় নাস্তিকতা তথা তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহকে[১৭] অস্বীকার করা গৌণ বিষয় মনে করা হয়; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা একমাত্র স্রষ্টা- এ কথা কেউ স্বীকার করতেও পারে আবার নাও করতে পারে। কিন্তু কেউ যদি বলে আল্লাহই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য তখনি দেখা দেবে নানান সমস্যা। তার মানে এখানে মৌলিক বিষয় হলো তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ।[১৮]

---

[১৭] তাওহিদুর রুবুবিয়্যাত হলো সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা এবং বিশ্বপরিচালনাকারী হিসেবে আল্লাহকে এক মানা। মক্কার মুশরিকরাও এই প্রকার তাওহিদের মৌলিক স্বীকৃতি দিত। তবে তা তাওহিদ হিসাবে শতভাগ বিশুদ্ধ ছিল না।

[১৮] তাওহিদুল উলুহিয়্যাত হলো আল্লাহকে একমাত্র ইবাদতের যোগ্য হিসেবে মেনে নেওয়া। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকে বিধানদাতা হিসেবে মানা। আর তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত হলো আল্লাহর যেসব গুণ আমরা কিতাব ও সুন্নাহর মাধ্যমে জানতে পেরেছি কোনোপ্রকার অংশীদারত্ব ছাড়া সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, অন্যকাউকে সেসব গুণের অধিকারী না মানা। এই দুই তাওহিদকেই কাফেররা মানত না। এই তাওহিদ-দুটো তৎকালীন সমাজে প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সেই সমাজকে জাহেলি সমাজ ও কুফুরি সমাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এমনকি আল্লাহর রাসুল আরবের যেই জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছেন, সেই জাতিরও মূল সমস্যা ছিল তাওহিদুল উলুহিয়্যাতে। তাদের মধ্যে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের মৌলিক স্বীকারোক্তি ছিল; কিন্তু আল্লাহর উলুহিয়্যাতকে তারা একেবারেই অস্বীকার করত।[১৯]

নাস্তিকতা কখনোই উম্মতের মাঝে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়নি এবং এর প্রভাবও নির্দিষ্ট পরিসরে সীমাবদ্ধ। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব অনেক বিস্তৃত। আমাদের কিশোর-সমাজ থেকে শুরু করে ইসলামি ঘরানাগুলো পর্যন্ত পাশ্চাত্য চিন্তাচেতনার ছোবলে আক্রান্ত। বিধ্বস্ত তাদের ঈমানি হালাত। এমনকি নাস্তিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতায় আকৃষ্ট এমন মুসলিমের সংখ্যাও আমাদের সমাজে কম নয়। একদম নিজের আশেপাশে তাকালেই এর বাস্তবতা দেখা যাবে। নাস্তিক হতে হলে পুরো ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করতে হয়, মুসলিম কমিউনিটি থেকেও কিছুটা দূরে সরে আসতে হয়। তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার ইরতিদাদের কবলে পড়লে বাহ্যিকভাবে ধর্মকর্ম ত্যাগ করতে হয় না। মানুষটি যে পাশ্চাত্য মনস্তাত্ত্বিক আগ্রাসনের শিকার এবং প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে সে ত্যাগ করেছে- এর অনুভবটাও তার মাঝে আসে না। অধিকন্তু নাস্তিকতা ও অন্যান্য সংশয় তৈরি হওয়ার প্রধান কারণও এই পাশ্চাত্য সভ্যতা। ফলে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম ভাবতে পছন্দ করে বটে; কিন্তু চেতনায় ধারণ করে আছে নাস্তিকতা।

দেখা যাবে, আমাদের আস্তিক নাস্তিক বিতর্কে অধিকাংশ প্রশ্নের উদ্ভব ঘটেছে পশ্চিমা নৈতিকতার মানদণ্ডকে অকাট্য হিসেবে মেনে নেওয়ার কারণে, যার সাথে রয়েছে ইসলামের মৌলিক সংঘর্ষ। বিজ্ঞান কিংবা

---

[১৯] যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। বলুন, তোমরা ভেবে দেখছ কি যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীরা তারই উপর নির্ভর করে। সুরা যুমার, আয়াত ৩৮।

আয়াতে সুস্পষ্টতই বলা হয়েছে- মক্কার কাফেররা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে আসমান-জমিনের স্রষ্টা বলে স্বীকার করত। কিন্তু তিনিই যে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণদাতা, তারা তা স্বীকার করত না। ফলে অন্যান্য আয়াতে এই শিরকি বিশ্বাসের কারণে তাদের কাফের বলা হয়েছে।

দর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন মাত্র কয়েকটি। বিবর্তন আর স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রশ্ন ছাড়া পূর্ণরূপে বিজ্ঞানের সাথে প্রাসঙ্গিক তেমন কার্যকর প্রশ্ন পাওয়া যাবে না। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তাত্ত্বিক কথাবার্তা সাধারণ মুসলিমদের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে না। আবার এই বিতর্কে একান্ত ব্যক্তিগত কিছু ফ্যাক্টও রয়েছে। সব মিলিয়ে দেখা যাবে মুসলমানদের মাঝে রিদ্দাহ কিংবা সংশয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে নৈতিকতার সাথে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নই বড় প্রভাব ফেলছে। ইসলামের হুদুদ, কিসাস, জিহাদ, ওয়ালা, বারা, নারী অধিকারসহ এমন নৈতিক বিষয়গুলোতেই মুসলিমরা বেশি হোঁচট খাচ্ছে, সংশয়ের শিকার হচ্ছে। কারণ বিজ্ঞানসংক্রান্ত প্রশ্নের চেয়ে এই প্রশ্নগুলো অধিক জীবনঘনিষ্ঠ। এই সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো মানুষের ব্যক্তি-জীবনকে প্রভাবিত করে বেশি।

আমাদের সমাজে পাশ্চাত্য নৈতিকতা এতটাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছে যে, ইসলামের নৈতিকতা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না। দীর্ঘ সময় যাবৎ সেক্যুলারিজম ও লিবারেলিজম দ্বারা পরিচালিত সমাজে বসবাস করার কারণে আমরা পশ্চিমা নৈতিকতা ও দর্শনকে পরম সত্য হিসেবে মনস্তাত্ত্বিকভাবে মেনে নিয়েছি এবং এটাকে চ্যালেঞ্জ করার পরিবর্তে নৈতিক মাপকাঠি কিংবা কম্পাস হিসেবে গ্রহণ করেছি। ফলে যখনই পশ্চিমা কাঠামোর সাথে ইসলামের কোনো অবস্থান মিলছে না, তখন কেউ কেউ ইসলাম নিয়ে সংশয়ে পড়ছে এবং শেষমেশ ঘোষিতভাবেই রিদ্দার পথ বেছে নিচ্ছে। আর অধিকাংশই ইসলামি অবস্থান প্রত্যাখ্যান করে এই পাশ্চাত্য-কাঠামো মেনে নিয়ে অঘোষিতভাবেই ইলহাদে জড়িয়ে পড়ছে। এটা হলো সাধারণ মুসলিমদের অবস্থা। যেসব আলেম, তালেবুল ইলম, ইসলামিক স্কলার এবং বুদ্ধিজীবী পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে মনস্তাত্ত্বিকভাবে পরাজয় বরণ করেছে, তারা এই প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে ইসলামের এমন নতুন ব্যাখ্যা হাজির করছে, সালাফদের মাঝে যার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না এবং সেটা পাশ্চাত্য কাঠামোর সাথে সাংঘর্ষিকও হয় না। বরং সেই ওয়েস্টার্ন ফ্রেমওয়ার্কের সাথে খাপ খায়। আর এখান থেকেই সৃষ্টি হয় মডার্নিজম ও রিভিশনিজম।[২০]

---

[২০] মডার্নিজম হলো শরিয়াহর শিক্ষাকে পাশ্চাত্য দর্শনের মানদণ্ডে বিচার করা এবং শরিয়াহর শিক্ষাগুলোকে এমনভাবে বদলে নেওয়া, যাতে ইসলামকে পাশ্চাত্য কাঠামোতে

এজন্য আমাদেরকে এরকম দাঈ ও স্কলারদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। পাশ্চাত্যের মোকাবিলায় পাশ্চাত্য কাঠামো ও মানদণ্ডকে মেনে নিয়ে বিজ্ঞান, স্বাধীনতা, সমতা, উন্নতি ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামকে সঠিক প্রমাণ করার প্রবণতা ছাড়তে হবে। এটা খুবই দুর্বল এবং রক্ষণাত্মক অবস্থান। বরং আমাদেরকে আক্রমণাত্মক অবস্থানে যেতে হবে। উলটো তাদের মাপকাঠিকে প্রশ্ন করা শিখতে হবে। বলতে হবে বিজ্ঞান কেন বিশুদ্ধ ও চূড়ান্ত মাপকাঠি নয়! বর্তমান বিজ্ঞান কীভাবে পক্ষপাতদুষ্ট! সমতা, স্বাধীনতা, উন্নতি কেন ন্যায় এবং নিরপেক্ষ নয়! প্রশ্ন করতে হবে আল্লাহর একজন দাস কোন অধিকারে স্বাধীনতা চাইবে! ইনসাফের পরিবর্তে সে কোন সাহসে সমতার কথা বলে! কোন অধিকারে সে উন্নতির খোদাপ্রদত্ত সংজ্ঞা বদলে ফেলে!

আবার ইসলামের সূত্র ছাড়া ন্যায়, শান্তি এবং অধিকারও কোনো মাপকাঠি নয়। কারণ ইসলামই একমাত্র হক ও ন্যায়। এর বাইরে সবকিছু বাতিল ও জুলুম। জানাতে হবে একমাত্র ইসলামই চূড়ান্ত ও বিশুদ্ধ মাপকাঠি। এভাবে নিজেদের মাপকাঠি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

মুসলিম-মানসে পাশ্চাত্য-পূজার যে মূর্তি তৈরি হয়েছে, তাকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করতে হবে। আঘাতে আঘাতে ভেঙে ফেলতে হবে। আর এজন্য জরুরি হলো পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কাঠামো সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং ইসলামের মৌলিক অবস্থান তথা সালাফে সালেহিনের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

খাপ খাওয়ানো যায়। আর রিভিশনিজম হলো শরিয়াহর শিক্ষার আলোকে পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান এবং কার্যক্রমকে শরিয়াহসম্মত বানানোর চেষ্টা করা। উভয়ের মাঝে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটা গুরুত্বপূর্ণ মিল আছে। তা হলো দুজনের কেউই পাশ্চাত্য কাঠামোকে আঘাত করতে চায় না এবং জরুরি কিংবা আবশ্যিক মনে করে না।

পরিভাষার চোরাবালি

পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পুরোপুরি অনুধাবন করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে পরিভাষা ও তার গুরুত্ব বুঝতে হবে। এই ইরতিদাদি সভ্যতাকে অনুধাবন করতে না পারার পেছনের একটি বড় সংকট হলো পারিভাষিক জটিলতা। পরিভাষা বলা হয় কোনো বিশেষ ঘটনা কিংবা বিশেষ চিন্তার সাথে কোনো শব্দ প্রয়োগ করা। যখন সেই শব্দ উচ্চারণ করা হবে, তখন সেই শব্দের পূর্ণ মর্ম সম্বোধিত ব্যক্তির মাথায় চলে আসবে। যেমন আমরা বলি- জাকাত। যদিও এর আক্ষরিক অর্থ পবিত্র, কিন্তু জাকাত বললে আমরা এক বিশেষ ধরনের 'অর্থ'কে বুঝি; আর তা হলো—ধনীর সম্পদে গরিবের হক। কোনো শব্দ নির্দিষ্ট পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করা হলে, তার শাব্দিক অর্থের কোনো মূল্য থাকে না।

প্রত্যেক জাতি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব কিছু পরিভাষা থাকে, যার প্রকৃত অর্থ তারাই সবচেয়ে ভালো জানে এবং তাদের থেকে সেই অর্থটা বুঝে নিতে হয়। কেবল শাব্দিক অর্থের বিবেচনায় সেই পরিভাষার মূলে পৌঁছা সম্ভব নয়। আরেকটি উদারহণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। যেমন মুসলিম সমাজে ব্যবহৃত একটি পরিভাষা হলো- 'ইদ্দত'। ইদ্দতের শাব্দিক অর্থ গণনা করা। কিন্তু মুসলিম সমাজে শব্দটির বিশেষ অর্থ রয়েছে। মহিলাদের একটি বিশেষ অবস্থাকে বুঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এখন কোনো ইংরেজ অভিধান খুলে দেখল যে, এই শব্দের অর্থ গণনা করা এবং সে এই অর্থই ব্যবহার করতে লাগল। যেমন, আপনি কারো সাথে দেখা করতে গেলেন। দরজায় নক করার পরেও সে বের হচ্ছে না। ভেতরে বসে সে তার বেতনের টাকা গুনছে। কিছুক্ষণ পর সে বের হয়ে এলো। আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, এতক্ষণ ভেতরে কী করছিলে? সে উত্তর দিল, ইদ্দত করছিলাম। এটা শোনার পর একজন মুসলমান অবশ্যই বিস্ময় প্রকাশ করবে। কারণ শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এমনিভাবে সালাত, সিয়াম, জাকাত, জিহাদ, খিলাফাহ, ইমারাহসহ

সবকিছুর একটি বিশেষ অর্থ এবং ধারণা রয়েছে। এখন যদি কোনো ইংরেজ এসব শব্দের নিজস্ব ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে থাকে, তা হলে একজন মুসলমান বলবে তোমার এই অধিকার নেই যে তুমি এসব পরিভাষার মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে বেড়াবে।

ঠিক এই কাজটাই আজ অধিকাংশ মুসলিম করছে। পশ্চিমের অবাক করা উন্নতি এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মুসলমানদের মোহগ্রস্ত করে রেখেছে। তারা পাশ্চাত্যের প্রতিটি স্লোগানের বৈধতা নির্মাণের চেষ্টা করছে এবং ইসলামকে সেসব স্লোগানের সাথে মেলাতে চাচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষী, যে জাতি নিজেদের আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যশীল করার চেষ্টা করেছে, সেই জাতির মাঝে ধর্মীয় বিশ্বাস, আমল- কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দমালা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে যেমন সেগুলোর ব্যাপারে ইসলামি পরিভাষা ব্যবহার করা যাবে না, ঠিক ইসলামি পরিভাষার ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য কোনো টার্ম ব্যবহার করা যাবে না। কারণ এর মাধ্যমে ইসলামি পরিভাষাগুলোর আসল মর্ম হারিয়ে যায় এবং এমন মর্ম ছড়ানোর অবস্থা তৈরি হয়, যা আসলে ইসলামি নয়। ফলে এর আলোকে শরিয়তের এক নতুন ব্যাখ্যার দ্বার উন্মোচন হয়, যা আল্লাহর শরিয়ত পরিবর্তন করার শামিল। আমাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে, কোনো পরিভাষাই নিরপেক্ষ নয়। প্রতিটি পরিভাষারই ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ও মর্ম রয়েছে। এজন্য তৃতীয় কোনো পরিভাষার ব্যবহার শুধু বোকামিই নয়; বরং ইসলামকে সংস্কার (ধ্বংস) করার এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্র।

যেকোনো পরিভাষাকেই তার ঐতিহাসিক ও বাস্তব প্রায়োগিক অবস্থান থেকে সরিয়ে অন্য অর্থে ব্যবহার করা অসম্ভব। স্বীয় আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি অন্য কোনো আদর্শের পরিভাষায় বয়ান করার অর্থ হচ্ছে সেই আদর্শকে নিজের আদর্শের মাঝে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। এমনকি কোনো আদর্শের ধারক-বাহকরাই তাদের পরিভাষাকে অন্য আদর্শের লোকেরা নিজস্ব অর্থে প্রচার করবে- এটা সহ্য করবে না। যেমন, কাদিয়ানিরা নিজেদের মুসলমান দাবি করে এবং নিজেদের ধর্মকে ইসলাম বলে; কিন্তু আমরা তাদের ধারণার ইসলাম প্রত্যাখ্যান করি এবং 'কাদিয়ানি

ইসলাম' নামক কোনো পরিভাষা মেনে নিতে মোটেই প্রস্তুত নই। বরং আমরা তাদেরকে ইসলাম থেকে খারিজ এবং কাফের বলেই সম্বোধন করি। কারণ গ্রহণযোগ্য মাধ্যম তথা কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মতের ইজমার মাধ্যমে যুগপরম্পরায় যে ইসলাম চলে এসেছে, আমাদের নিকট তা-ই একমাত্র ইসলাম। এর বাইরে অন্যকিছু ইসলাম নয়। এমনিভাবে পাশ্চাত্য শব্দমালাও একটি আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা যদি সেগুলোকে ইসলামি বানাতে যাই, পশ্চিমারা সেগুলোর পরিবর্তিত অর্থ কখনোই মেনে নেবে না। তারা আপনার উদ্দেশ্যগত পরিভাষায় আলোচনা করবে- এই আশা করা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই না।

পশ্চিমাদের প্রতিটি পরিভাষাকে 'ইসলামের সম্পত্তি' কিংবা 'ইসলামের সাথে আত্মীকরণ করে বা ইসলামের অতীত' বানিয়ে প্রচার করা মূলত ইসলামি শিক্ষাকে পশ্চিমা চশমায় দেখার ফল। এটা আদর্শিক পরাজয় ছাড়া কিছুই নয়। চিন্তা করুন, শিল্পবিপ্লবের সময় পশ্চিমারা খ্রিষ্টধর্ম ও তার পুরোহিততন্ত্রের পরাজয় নিশ্চিত করে। কিন্তু তারা এই বিজয় অর্জন করার পথে কৌশল হিসেবে কখনোই খ্রিষ্টীয় পরিভাষা ব্যবহার করেনি এবং নিজেদের আদর্শিক প্রচার-প্রসারেও স্থান দেয়নি। এমনিভাবে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো যখন মুসলমানদের অঞ্চলের খেলাফত-ব্যবস্থা ধ্বংস করছিল, তখন তারা মুসলমানদের মাঝে নিজেদের স্থান করে নেওয়ার জন্য 'গণতান্ত্রিক খিলাফাত' কিংবা 'পশ্চিমা খেলাফত'-এর মতো কোনো পরিভাষা ব্যবহার করেনি। বরং সর্বত্র নিজেদের আদর্শিক ও ঐতিহ্যবাহী পরিভাষা 'গণতন্ত্র', 'সেক্যুলারিজম'-এর প্রচলন ঘটিয়েছে।

তা হলে মুসলমানরা কেন পৃথিবীতে নিজেদের স্থান করে নিতে এসব পাশ্চাত্য শব্দের আশ্রয় নেবে? আমাদের এতটুকু সাহস কি নেই যে, আমরা পশ্চিমা পরিভাষা প্রত্যাখ্যান করে তার স্থলে ইসলামি পরিভাষা ও চেতনাভিত্তিক মর্মের প্রসার ঘটাব? এটা না পারা আমাদের আদর্শিক পরাজয়ের দলিল। মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ে আমরা পরাজিত। রাজনৈতিক বিজয়ের প্রথম শর্তই হচ্ছে চিন্তাযুদ্ধে বিজয়ী থাকা। এটা ছাড়া বিজয়ের কল্পনা করা যায় না।

শব্দ ও পরিভাষা প্রতিটি সভ্যতার জন্য একধরনের অস্ত্র। প্রতিটি পরিভাষার পেছনেই থাকে নিজস্ব ঐতিহাসিক ও আদর্শিক ফ্যাক্ট।

অদৃশ্যভাবেই এই পরিভাষাগুলো সংশ্লিষ্ট মতবাদকে পাকাপোক্ত করে। ভিনজাতির মাঝে এগুলো ঢুকিয়ে দিতে পারলে যতই তারা এর নানান ব্যাখ্যা হাজির করুক, সবশেষে তা নিজ আদি ও মূল বয়ানের দিকেই ফিরবে এবং সমাজে এর প্রভাবই বিস্তার হতে থাকবে। ধীরে ধীরে তা প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ড হয়ে ইউনিভার্সাল কিংবা সর্বজনীন হতে থাকে। আমরা যদি ইসলামের নিজস্ব পরিভাষাগুলো মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারি, এটা পাশ্চাত্যের মোকাবিলায় বিশাল ভূমিকা পালন করতে পারে। খিলাফাহ, ইমারাহ, শরিয়াহ চাওয়ার পরিবর্তে যেদিন থেকে সেক্যুলারিজম, গণতন্ত্র চাওয়া শুরু করেছি, সেদিন থেকেই এই সমাজে খিলাফাহ, ইমারাহ শব্দগুলো জঙ্গিবাদের সমার্থক হয়ে গেছে। এখন কেউ গণতান্ত্রিক সেক্যুলার-ব্যবস্থা বাতিল মনে করলে এবং তার পতন কামনা করলে তাকে জঙ্গি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়; অথচ ঈমানের দাবিই হলো ইসলামি-ব্যবস্থা ছাড়া সমস্ত ব্যবস্থা বাতিল মনে করা। সেগুলোর বিলুপ্তি কামনা করে ইসলামকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

তা ছাড়া এখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তাশাব্বুহ তথা সামঞ্জস্য। ইসলাম সর্বক্ষেত্রেই তাশাব্বুহর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে এবং নিরুৎসাহিত করেছে। এমনকি ইবাদতের মতো বৈধ বিষয়েও ইসলাম সামঞ্জস্যকে বারণ করেছে। পারলে ভিন্ন সভ্যতার প্রতিটি বিষয়েই বৈপরীত্য রাখার কথা বলেছে। এজন্য মক্কার কাফেররা রেগে গিয়ে বলতো-এই লোক (মুহাম্মদ) কী চায়! সে তো এমন কিছুই বাদ রাখছে না, যেখানে সে আমাদের বিরোধিতা করছে না।[২১]

ইসলামি শরিয়তে পরিভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের সালাফগণ পরিভাষার আলোচনার প্রতি খুব গুরুত্ব প্রদান করতেন। পরিভাষাশাস্ত্র নিয়ে অনেকে আলাদা গ্রন্থও রচনা করেছেন। প্রতিটি শাস্ত্র ও মতবাদ বুঝানোর জন্য পরিভাষা বুঝা প্রথম শর্ত। পরিভাষা নির্জীব নয়; বরং জীবন্ত ও প্রভাবক। পরিভাষা মানুষের চিন্তাগঠনের হাতিয়ার, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের অস্ত্র।

---

[২১] সহিহ মুসলিম-৩০২

কোনো শব্দকে তার পারিভাষিক অর্থ থেকে বের করে অন্য অর্থে ব্যবহার করা একটি ভয়াবহ ফেতনা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এমন এক সময় আসবে যখন আমার উম্মতের কিছু মানুষ মদকে ভিন্ন নাম দিয়ে পান করবে।'[২২]

এক হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কেউ আঙুরকে (বুঝাবার জন্য) الْكَرْمُ বলবে না। কারণ, الْكَرْمُ তথা বদান্যতা ও মর্যাদা মুসলিমদের জন্য।'[২৩]

হাদিসটি পরিভাষার আগ্রাসন বুঝতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ এর একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি এই নিষেধাজ্ঞার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আরবরা 'কারম' শব্দটি আঙুরের গাছ, আঙুর এবং আঙুর দিয়ে তৈরি মদের জন্য ব্যবহার করত। যেহেতু মদটা আঙুর থেকে তৈরি; তাই মদের ক্ষেত্রেও এই শব্দ ব্যবহার করত। এখন ইসলামি শরিয়ত আঙুর ও তার গাছের জন্যও এই শব্দের ব্যবহারকে অপছন্দ করল। কারণ যখনই তারা এই শব্দ শুনবে, তখন তাদের মদের কথা মনে পড়বে। তাদের মন সেদিকে ধাবিত হবে এবং শেষমেশ মদের নেশায় পড়ে যাবে কিংবা কাছাকাছি কিছু হয়ে যাবে।[২৪]

পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। মহান আল্লাহ সুরা বাকারার ১০৪ নং আয়াতে মুসলিমদের راعنا (রা-ঈনা) শব্দ উচ্চারণ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ ইহুদিদের সমাজে এই শব্দের ভিন্ন একটি অর্থ ছিল। কাউকে বোকা বুঝানোর জন্য তারা এই বলে সম্বোধন করত। কিন্তু সাহাবিরা এই শব্দ ব্যবহার করত আরেক অর্থে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য সাহাবিগণ 'রা-ঈনা' বলত। মানে আমাদের কথা শুনুন কিংবা আমাদের প্রতি লক্ষ করুন। এই সুযোগে ইহুদিরা হাসি-তামাশা করত। এতদিন যে তারা বলাবলি করত- মুহাম্মদ বোকা (নাউযুবিল্লাহ) এখন তার অনুসারীরাই তাকে প্রকাশ্যে এই কথা বলছে; এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু

---

[২২] ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান- ৪০২০

[২৩] সহিহ মুসলিম- (ইফা ৫৬৭২)

[২৪] আল-মিনহাজ, ৫/১৫, বৈরুত, দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবিয়্যাহ

ওয়া তায়ালা আয়াত নাজিল করে এই শব্দ ব্যবহার করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তিনি বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

> হে মুমিনগণ, (তোমরা মুহাম্মাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তাকে) 'রা-ঈনা' বলবে না; বলবে 'উনযুরনা' (আমাদের প্রতি খেয়াল করুন)। এবং (তার নির্দেশ) শুনে নাও। আর অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।[২৫]

ইসলামের ইতিহাসে এরকম অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। এজন্য ইসলামের কোনো বিধানের জন্য পাশ্চাত্যের পরিভাষা বা শব্দের ব্যবহার এবং পাশ্চাত্যের কোনো বিষয়ের জন্য ইসলামি পরিভাষার ব্যবহার উভয়ই পরিত্যাজ্য। আল্লাহ ও তার রাসুল এই ধরনের কাজ পছন্দ করেননি। আমাদের সালাফগণও ছিলেন এব্যাপারে খুব সতর্ক। গ্রিক কিংবা রোমান সভ্যতার কোনো বিষয়ের জন্য সালাফরা ইসলামি পরিভাষা প্রয়োগ করেননি এবং নিজস্ব পরিভাষাও কখনো বর্জন করেননি। এটা খুবই জঘন্য কাজ। ইসলামি দর্শনের সাথে পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক একটি বিষয় এবং আদর্শিক পরাজয়ের নিদর্শন। পশ্চিমা পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন দীনের বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে অপরদিকে পশ্চিমা মাপকাঠিগুলো আমাদের সমাজে সর্বজনীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আর নিজেদের মাপকাঠি আমাদের কল্পনা থেকেই হারিয়ে যাচ্ছে, দাবি তো অনেক দূরের কথা। আর এভাবেই আমরা পরিভাষার চোরাবালিতে ঘুরপাক খাচ্ছি শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে।

---

[২৫] সুরা বাকারা, আয়াত ১০৪

আধুনিক পশ্চিমের শেকড়

আমাদের একটি বড় সমস্যা হলো আংশিক মূল্যায়ন। বর্তমান যুগের বিভিন্ন মতবাদকে শুধু বাহ্যিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যাচাই করা একটি ভুল প্রক্রিয়া। বরং প্রতিটি মতবাদকেই তার নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক, শাস্ত্রীয় এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে হবে। পাশাপাশি সেগুলোর বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হবে। যদি এমনটি না করা হয়, তা হলে নিশ্চিতভাবেই আমরা ভুল জায়গায় ফিকহের দলিল প্রয়োগ করে বসব। এতে করে শরিয়াহ যেই ধরনের ব্যক্তিত্ব, সমাজ ও রাষ্ট্রের দাবি করে, তা বাধাগ্রস্ত হবে। শরিয়াহর উদ্দেশ্য বিনষ্ট হবে এবং তা অকার্যকর হতে থাকবে। মনে রাখতে হবে, শরিয়তের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তার নির্ধারিত কাঠামো ও ভাষার মধ্য দিয়েই অগ্রসর হতে হবে। অন্যথায় পাশ্চাত্য মতবাদগুলোই উন্নতি লাভ করবে এবং প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে। সুতরাং ইতিহাস, দর্শন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্দেশ্য, ফল এবং বাস্তবতার ভিত্তিতেই পাশ্চাত্য নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। আর পর্যালোচনার এই পদ্ধতিকে বিবেচনা করেই এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হবে ইনশাআল্লাহ।

গ্রিক সভ্যতাকে ইউরোপীয় সভ্যতার সূচনাকাল হিসেবে গণ্য করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় ইউরোপের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশকে আটটি সময়কাল ধরে বর্ণনা করা যেতে পারে। গ্রিক, রোমান, মধ্যযুগ, রেনেসাঁ বিপ্লব, যুক্তিবাদ, ফরাসি বিপ্লব, ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দী।

গ্রিক সভ্যতা

খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাচীন গ্রিসে বিখ্যাত অনেক দার্শনিকের জন্ম হয়েছিল। মধ্যযুগের পর যখন খ্রিষ্টধর্ম চরমভাবে বিকৃত হয় এবং মানুষ পোপতন্ত্রের ক্ষমতা ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, সেই সময়টাতে এসব দার্শনিক খ্রিষ্টান সমাজে গভীর প্রভাব ফেলে। সেসময় মানুষের

মাঝে ধর্মের বিরোধিতার বলয় তৈরি হচ্ছিল এবং যুক্তিবাদের প্রচলন ঘটছিল। সাথে সাথে ধর্ম-সংস্কারের স্লোগানও জোরদার হচ্ছিল। তাই একটি বৈধ আন্দোলনের অবধারিত ফল হিসাবে ধর্মের ব্যাপারে যেকারো স্বেচ্ছাচারিতার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। সাধারণ-বিশেষ সকলেই তাদের ধর্মের সমালোচনা এবং পর্যালোচনাকে অধিকার হিসেবে গ্রহণ করল।

কান্ট (২২ এপ্রিল ১৭২৪-১২ ফেব্রুয়ারি ১৮০৪), দেকার্ত (৩১ মার্চ, ১৫৯৬-১১ ফেব্রুয়ারি, ১৬৫০), হেগেল (২৭ আগস্ট, ১৭৭০-১৪ নভেম্বর, ১৮৩১) ও জন লকের মতো ব্যক্তিদের দার্শনিক চিন্তাধারা উক্ত প্রবণতাগুলোর রসদ যুগিয়েছিল। আর এর মধ্য দিয়েই তারা খ্রিষ্টান সমাজে ব্যাপক পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এসব দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি যদিও বাহ্যিকভাবে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) ও প্লেটোর দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করত; কিন্তু এসব প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক কিছুই সেই গ্রিক সভ্যতা থেকে নেওয়া হয়েছে। গ্রিক সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও মৌলিকভাবে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে তারা সকলেই একমত।

এক. যদিও পশ্চিমারা অ্যারিস্টটলের প্রতি অভিযোগ করে যে, সে কেবল আকল বা মানবীয় বিবেকের উপর নির্ভর করত, অভিজ্ঞতা ও অবলোকনের কোনো তোয়াক্কা করত না; তবে তাদের এই অভিযোগ সত্য নয়। বরং অভিজ্ঞতা ও অবলোকনকে চূড়ান্ত মানার প্রবণতা অ্যারিস্টটলের দর্শনেও ছিল। আর পশ্চিমা সভ্যতায় পরিপূর্ণরূপেই এই প্রবণতাগুলো বর্তমান রয়েছে।

দুই. গ্রিক-দর্শনের প্রধান মনোযোগ ছিল বস্তুজগৎ। তাদের চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরকালের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এই বস্তুবাদী চেতনাই পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে বিরাজ করছে।

তিন. গ্রিক সভ্যতায় প্রতিটি বিষয়কেই স্বাধীনচেতা মানুষের দৃষ্টিতে দেখা হতো। যে বিষয়টিই তাদের এমন মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে যেত, তাকে মন্দ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করত। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতায় এই প্রবণতা 'হিউম্যানিজম'-এর রূপ ধারণ করেছে।[২৬]

---

[২৬] জাদিদিয়্যাত, ২৬; ড. হাসান আসকারি রহ.

সাংস্কৃতিক তৎপরতা

দর্শন কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি সাংস্কৃতিকভাবেও গ্রিক সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্যের মিল পাওয়া যায়। বাহ্যত দেখা যায়, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক কিছুই গ্রিক সভ্যতা থেকে গৃহীত। বলা যায়, পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রিসের রঙে রঙিন।

পিথাগোরাস ছিল (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭০-৪৯৫) একজন প্রসিদ্ধ গ্রিক-দার্শনিক এবং গণিতবিদ। সে-ই সর্বপ্রথম পৃথিবীকে গোলাকার বলেছিল এবং সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। পাশাপাশি সে একজন ক্রীড়াবিদও ছিল। স্কুলগুলোতে আজও তার ক্রীড়াবিজ্ঞানের থিউরি পড়ানো হয়। পিথাগোরাসের স্কুলে তখনকার সময়েই সহশিক্ষা চালু ছিল। প্লেটোর প্রায় দুইশত বছর পূর্বেই সে নারী-পুরুষের সমতার কথা বলেছে। তার কাছে নারী-পুরুষের সব অধিকার সমান। কারো অধিকার কারো থেকে কমবেশি নয়।[২৭]

প্রটাগোরাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯০-৪২০) ছিল আরেক সোফিস্ট[২৮], গ্রিক দার্শনিক। তার একটি প্রসিদ্ধ বক্তব্য রয়েছে। সেই বক্তব্য থেকে গ্রিক সভ্যতার চিন্তাগত ভিত্তি বুঝা যায়। তার বক্তব্য হলো, 'মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি। সততা ও কল্যাণের মানদণ্ড মানুষ নিজেই নির্ধারণ করবে। মানুষ যাকে মন্দ মনে করবে, তাই মন্দ। যাকে সে ভালো মনে করবে, তাই ভালো।'[২৯]

তখনকার সময় ছেলেমেয়েরা একসাথে নাচ-গান, খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করত। অনেক সময় সেখানে উলঙ্গ হয়ে পারফরমেন্স কর[illegible] হতো। যা[illegible] থিয়েটারের আয়োজন করত পুণ্যের আশায়। তারা ধারণা করত- [illegible] তাদের প্রভু খুশি হয়। প্রাচীন গ্রিসে অলিম্পিক গেইমসের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসত এবং অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে

---

[২৭] রেওয়ায়েতে তামাদ্দুনে কদিম-১৩১, সাইয়েদ আলি আব্বাস জালালপুরি

[২৮] Sophistes শব্দটি গ্রিক। এর উৎপত্তি Sophia শব্দ থেকে। যার অর্থ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। কিন্তু শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতার প্রতি ইঙ্গিত করে। সাধারণভাবে তাদেরকে সোফিস্ট বলা হয়, যারা কেবল ফিলোসফিই না; বরং মানবীয় বিভিন্ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। (Stanford Encyclopedia Of Philosophy)

[২৯] রেওয়ায়াতে তামাদ্দুনে কদিম-১৩৪

খেলায় অংশগ্রহণ করত। দৌড়, কুস্তি, নৌকাবাইচ ছাড়াও বিভিন্ন খেলার ব্যবস্থা থাকত।[৩০]

এগুলো নিছক কিছু উদাহরণ, যেখানে গ্রিক ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও চিন্তার মিল রয়েছে। গ্রিক সভ্যতায় এরকম অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে, যেগুলো পাশ্চাত্যে আরো উন্নত, ব্যাপক এবং ধ্বংসাত্মকভাবে বিরাজ করছে।[৩১]

রোমান সভ্যতা

পাশ্চাত্য সভ্যতা কিছুটা রোমান সভ্যতা দ্বারাও প্রভাবিত। রোমান সভ্যতা মূলত নিজেই বিভিন্ন সভ্যতার সংমিশ্রণ ছিল। এটার কারণ হলো, পূর্বে রোমানদের ভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা ছিল। যখন রোমানরা গ্রিস জয় করে নিল, তখন গ্রিক সভ্যতা রোমান সভ্যতায় স্থানান্তরিত হতে থাকে। তারা প্লেটো (খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৩/২৪—৩৪৭/৪৮) এবং অ্যারিস্টটলের চিন্তাধারা প্রত্যাখ্যান করলেও আবার গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাসের (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪১-২৭০) দর্শন গ্রহণ করে। তার দর্শনের ভিত্তি ছিল মানবীয় প্রবৃত্তি। উপকরণ সংগ্রহ এবং ভোগ-সুখই জীবনের সার্থকতা। ফলে রোমানদের জীবনযাপন পদ্ধতি ছিল বিলাসবহুল এবং আয়েশি। এভাবে গ্রিক দর্শন, রোমান জীবনাচার এবং আশেপাশের নানান তৎপরতা মিলে রোমান সভ্যতা অস্তিত্ব লাভ করে। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে রোমানরা দুর্বল ছিল। কিন্তু সামরিকভাবে শক্তিশালী ছিল। সামরিক শক্তির বলেই তারা নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক এবং বাণিজ্যিকভাবে উন্নত করতে পেরেছিল।[৩২]

পাশ্চাত্য সভ্যতায় যেসব রোমান দর্শনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমিত্ব ও বিলাসিতা। পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবত রোমানরাই একমাত্র জাতি, যারা এটাকে দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তবে মজার ব্যাপার হলো, পাশাপাশি একধরনের বিপরীতমুখী প্রবণতাও ছিল তাদের মাঝে। প্রবৃত্তি দমিয়ে রাখা। একই সময়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাঝে

---

[৩০] রেওয়ায়েতে তাহজিবে কদিম- ১৩০-১৪৭

[৩১] তাআরুফে তাহজিবে মাগরিব- ৭৭-৮০

[৩২] প্রাগুক্ত- ৮০

বিপরীতমুখী দুই প্রবণতা কাজ করত।[৩৩] তবে তাদের উক্ত প্রবৃত্তি-বিরোধিতা নির্দিষ্ট কিছু স্বার্থের জন্য। ইসলামের মৌলিক 'কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ' চর্চার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। দেশ ও জাতির পার্থিব কল্যাণের জন্যই কেবল তারা প্রবৃত্তির বিরোধিতা করত, যা ছিল কেবল আক্ষরিক বিরোধিতা।

রোমান সংস্কৃতি

দর্শনের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও রোমান সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্যের মিল দেখা যায়। যেমন গণতান্ত্রিক রূপরেখা, ব্যাংকিং সিস্টেম। প্রাচীন রোমান সমাজে এগুলোর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।[৩৪]

গণতান্ত্রিক সিস্টেম

খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর দুই বড় সাম্রাজ্যেই গণতান্ত্রিক সিস্টেম ছিল। গ্রিসে যখন সক্রেটিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭০-৩৯৯)-কে বিষ পান করানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তখন রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক ছিল। এমনিভাবে প্রথমদিকে রোমান সাম্রাজ্যও গণতান্ত্রিক কাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেমন: কাদিম তাহজিবেঁ আওর মাজহাব (প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্ম) গ্রন্থে আছে, 'রোমান সাম্রাজ্যে আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা ছিল সিনেট অথবা সিনেটকর্তৃক মনোনীত কমিশনারের হাতে।'[৩৫]

গণতন্ত্র, ব্যাংকিংসহ অনেক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবস্থাপনাই আধুনিক কালের আবিষ্কার নয় এবং এগুলো ইসলাম থেকেও গৃহীত নয়; বরং গ্রিক ও রোমান সভ্যতা থেকেই এসব গ্রহণ করা হয়েছে। অন্ততপক্ষে এতটুকু বলা যায় যে, গ্রিক ও রোমান সভ্যতায় সেগুলোর অস্তিত্ব ছিল। তবে এগুলোর বিশ্বায়ন এবং পরিকল্পনা-মাফিক প্রয়োগ আধুনিক ইউরোপে হয়েছে। আর এর পেছনে খলনায়ক হিসেবে কাজ করেছে ইহুদি সম্প্রদায় এবং তাদের নানান প্রকাশ্য ও গোপন সংঘ।

---

[৩৩] জাদিদিয়্যত- ২৯

[৩৪] কদিম তাহজিবেঁ আওর মাজহাব- ৮২

[৩৫] কদিম তাহজিবেঁ আওর মাজহাব-২১৫

এই ইতিহাসের মাধ্যমে 'ইসলামি গণতন্ত্র'র মতো পরিভাষা আবিষ্কারকারীদের অসারতা খুব সহজেই বুঝা যায়। ইসলামি ইতিহাসে এমন কোনো ফকিহ, মুজতাহিদ, স্কলার কিংবা দার্শনিক পাওয়া যাবে না, যিনি ইসলামের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গণতন্ত্র, ডেমোক্রেসি বা জমহুরিয়্যতের বয়ানে উল্লেখ করেছেন। এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যিনি খোদার প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে সর্বশ্রেণির মানুষের মতামত কিংবা জনপ্রতিনিধিত্বের ধারণা পেশ করেছেন। খেলাফতে রাশেদাতেও এর অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। আমাদের সালাফগণ খ্রিষ্টপূর্ব শতাব্দীর গ্রিক ও রোমান সভ্যতার ব্যাপারে খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। তা সত্ত্বেও তারা সেসব ব্যবস্থাপনা ও দর্শনের ইসলামি ব্যাখ্যা হাজির করেননি। ইমাম মাওয়ারিদি, আবু ইয়ালা, ইবনে খালদুন, শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতো মুসলিম চিন্তক ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের কেউই ইসলামি ইমারাহ ও খিলাফাহর গণতান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রদান করেননি।

মধ্যযুগ

পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে গ্রিক ও রোমের পর আসে খ্রিষ্টীয় যুগ, যাকে মধ্যযুগ, অন্ধকার যুগও বলা হয়।[৩৬] এই যুগটা খ্রিষ্ট পঞ্চম শতাব্দী থেকে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গ্রিক ও রোমান সভ্যতা তখনো টিকে ছিল; তবে তা ছিল ধর্মের অধীন ও অনুগামী হয়ে। কারণ রোম সম্রাট তখন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছিল। মধ্যযুগের দার্শনিকদের একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। অধিকাংশ দার্শনিক কিংবা বিজ্ঞানী হতো ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ। হাজার বছরের এই দীর্ঘ সময়ে অনেক চিন্তাবিদ এবং দার্শনিক জন্ম নিয়েছে। তবে তাদের মধ্যে দুজনকে প্রধান স্থানে রাখা যেতে পারে।

১. সেন্ট অগাস্টিন।

২. সেন্ট থমাস একুইনাস।

অগাস্টিনের মূল দর্শন ছিল প্রভুর সান্নিধ্য লাভ। সে খ্রিষ্ট চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর দার্শনিক ছিল। অগাস্টিন এমন কিছু দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে, যেগুলো মূলত প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দর্শনের রঙে রঙিন ছিল। সে

---

[৩৬] ঠিক এ সময়টাই ছিলো ইসলামের স্বর্ণযুগ। প্রায় অর্ধপৃথিবীজুড়ে ইসলাম তখন প্রতিষ্ঠা করেছে তাওহিদ, জ্ঞানবিজ্ঞান, ইনসাফ, নৈতিকতা ও মানুষের অধিকার।

নিজে ধার্মিক হলেও এমন কিছু দৃষ্টিভঙ্গি রেখে গেছে, পরবর্তীকালে যা সেক্যুলারিজমের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখে। যেমন City of God (Civitas Dei) এবং City of Men এর থিওরি খ্রিষ্টান-মানসে সে-ই প্রতিষ্ঠা করে।[৩৭]

যেহেতু খ্রিষ্টানদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত ছিল গ্রিক ও রোমান সভ্যতার উপর, সেজন্য সেন্ট থমাস একুইনাস সে সময় গ্রিক সভ্যতার উপর মুসলিম দার্শনিকদের আপত্তিগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে। খ্রিষ্টান সমাজে এটাকে তার সবচেয়ে বড় কীর্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

পরবর্তীতে সেন্ট থমাস অ্যারিস্টটলের দর্শনের সাথে খ্রিষ্টবাদকে ঢেলে সাজায়। মি. থমাস অ্যারিস্টটলের Politics-এর উপর আলোচনামূলক একটি গ্রন্থ রচনা করে এবং অ্যারিস্টটলের দর্শনের সঙ্গে খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করে। কিন্তু ১০০ বছর পার না হতেই বিভিন্ন দার্শনিক অ্যারিস্টটলের দর্শনের উপর আপত্তি তুলতে থাকে। ঐ সময় অ্যারিস্টটলের দর্শনের উপর আপত্তি তোলা ছিল খ্রিষ্টবাদের উপর আপত্তি তোলার শামিল। ফলে থমাস একুইনাসের মহান কীর্তির ফলে, অ্যারিস্টটলের উপর উত্থাপিত সেসব আপত্তি খোদ খ্রিষ্টধর্মের উপর আঘাত হানতে লাগল। এর মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টানধর্ম বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হলো এবং তখন থেকেই বিশেষ করে ইউরোপে ধর্মবিকৃতির দ্বার উন্মোচিত হতে লাগল।[৩৮]

পাশ্চাত্য সভ্যতা মূলত খ্রিষ্টানধর্মের পরাজয় ও বিকৃতির ফল। মধ্যযুগের ব্যাপারে দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন, ১৮শ শতাব্দীর যুক্তিবাদী এবং ১৯শ শতাব্দীর প্রাচ্যবিদরা এই যুগের ব্যাপারে

---

[৩৭] অগাস্টিন De civitate Dei contra paganos বইয়ে বলেন যে মানবজাতি সূচনালগ্ন থেকে City of Men আর City of God –এর মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। City of Men তথা দুনিয়াবি শহর হলো ওই সব মানুষের, যারা শুধু দুনিয়া ও কেবলই বর্তমান স্বার্থ নিয়ে চিন্তিত। City of God হলো ঐ মানুষদের নিয়ে, যারা দুনিয়ার আনন্দ ত্যাগ করে আখেরাতে রাজত্ব করতে চায়। পরে এই তত্ত্ব ব্যবহার করে সংস্কারবাদীরা ইউরোপে ইহজাগতিকতা অর্থে সেকুলারিজমকে প্রতিষ্ঠা করে।

Rex Martin, The Two Cities in Augustine's Political Philosophy, Journal of the History of Ideas, Vol. 33, No. 2 (1972), pp. 195-216

[৩৮] জাদিদিয়্যত- ৩৭

অনেক প্রোপাগান্ডা ছড়িয়েছে; যদিও তখনকার সময় শাসক এবং পোপদের কিছু সমস্যা ছিল; কিন্তু ধর্মীয় কর্তৃত্বের উপর আঘাত হানাকে বৈধতা দেবার জন্য যে চিত্র তারা আঁকে, তাতে অতিরঞ্জন এবং মিথ্যাচার ছিল। তারা মধ্যযুগকে 'অন্ধকার যুগ' বলে আখ্যায়িত করে। এর একমাত্র কারণ ধর্ম। কারণ দর্শনকে তখন ধর্মের উপর মর্যাদা দেওয়া হতো না। ধর্মবিরুদ্ধ নতুন কোনো চিন্তা-দর্শনের আবির্ভাব ঘটলেই তাকে শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে দমন করা হতো। তখন কিছু কিছু মুসলিম দার্শনিকেরও প্রভাব ছিল খ্রিষ্টান সমাজে। সেই যুগে যদিও পাদরি ও শাসকশ্রেণির পক্ষ থেকে কিছু নিপীড়ন ও অসততা প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। সামাজিক অবস্থা ভালো ছিল। সুদ, ব্যভিচার এবং সামগ্রিক অর্থে অনৈতিকতার ব্যাধির এতো ব্যাপকতা ছিল না। অন্য দিকে এই পুরো সময়টা ছিল ইসলাম ও পৃথিবীর সোনালি যুগ। মূলত সর্বত্র ইসলামধর্মের কর্তৃত্ব ও সাফল্য এবং বিশেষত খ্রিষ্টানদুনিয়ায় ধর্মীয় প্রভাব থাকার কারণেই তারা এই সময়কে অন্ধকার যুগ বলতে চায়। বড় পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের মুসলিমরাও মধ্যযুগীয় বর্বর, অন্ধকার যুগ ইত্যাদি বলে থাকে। এমনকি ইসলামের বিধানকেও এসব বলে কটূক্তি করতে ছাড়ে না। নিশ্চিতভাবেই এমন বিশ্বাস নিজ ঈমানের জন্য ক্ষতিকর।

প্রথমদিকে মানুষের দাবি ছিল পোপ এবং রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কারের। কিন্তু একপর্যায়ে এটা ধর্ম থেকে মুক্তি ও স্রষ্টার উপর ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার আদায়ের আন্দোলন ও মতবাদে রূপ নেয়। আর এটাকে তারা 'এনলাইটেনমেন্ট' (আলোকায়ন) বলে গর্ব করে। তাদের কাছে আলোকিত হওয়ার অর্থ হলো ধর্মীয় কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে যাওয়া,[৩৯] ইসলাম যাকে অন্ধকার বলেছে। ফলে পাশ্চাত্য এনলাইটেনমেন্টের ইসলামি মিনিং হলো অন্ধকার হওয়া।

বর্তমান সময়েও আধুনিক শিক্ষিত মুসলিমরা আলেমদের দীনি ও ইলমি কর্তৃত্বের ব্যাপারে নানা অবান্তর ধারণা পোষণ করে। তারা ইসলামের সঠিক বুঝের ক্ষেত্রে ইলমের পরম্পরাসূত্র এবং ধারাবাহিক বুঝকে অবজ্ঞা

---

[৩৯] যদিও বিকৃত ধর্মের কর্তৃত্ব থেকে বের হওয়াটা জরুরি ছিল; কিন্তু বাস্তবতা হলো নিজের বিবেক নয়; বরং ইসলামের কাছে আত্মসমর্পিত হলেই তারা আলোর সন্ধান পেত।

করে। ইসলামের 'কথিত আধুনিকায়ন' কামনা করে। আলেমদের দলিলভিত্তিক ধর্মীয় সিদ্ধান্তকে তারা পোপতন্ত্রের মতো ফতোয়াবাজি বলে গালমন্দ করে। এটা এই ধর্মবিদ্বেষী পাশ্চাত্য মানসিকতারই প্রভাব।[৪০]

রেনেসাঁ বা নবজাগরণ (আধুনিকতার সূচনা)

১৪৫৩ সাল থেকে সাধারণত রেনেসাঁর সূচনা ধরা হয়। মাঝখানে এক দীর্ঘ সময় গ্রিক দর্শন ছিল খ্রিষ্টান ধর্মের অধীনে। তাদের মতে, যেহেতু গ্রিক ও রোমান সভ্যতার পতনের পর ইউরোপের মেধায় পচন ধরেছিল এবং ১৫শ শতাব্দীতে এসে সেই মেধা আবার সচল ও সজীব হয়ে উঠেছিল; তাই এই যুগকে তারা রেনেসাঁর যুগ বলে।[৪১] ১৫শ শতাব্দীতে এসে আবার গ্রিক সভ্যতা প্রাধান্য পেতে থাকল ধর্মের উপর। মানুষের মন-মস্তিষ্ক থেকে ধর্মীয় চেতনা একেবারে বিলুপ্ত হতে লাগল। এক নতুন রূপে মানববাদের চর্চা শুরু হলো, যা মূলত ছিল মধ্যযুগে খ্রিষ্টধর্মকে ত্যাগ করার নামান্তর। মানুষ কথিত ব্যক্তিসত্তাবোধ চিনতে লাগল এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন হওয়ার জোয়ার শুরু হলো। তখন reformation-এর নামে যে আন্দোলন দানা বেঁধেছিল, ১৭শ এবং ১৮শ শতকে এসে তা উপহার দিল পুরোপুরি ধর্মহীনতার চিত্র। এই আন্দোলনের সুবাদে পরবর্তীকালে ধর্মহীনতা এবং মানববাদের এমন যুগ এলো যে, মানুষ নিজেকে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবতে লাগল। এভাবে রেনেসাঁ এবং রি-ফরমেশনের আন্দোলন একসাথে চলছিল।

এই সময়টাতে এবং পরবর্তীকালে যত ধরনের ভ্রান্তির জন্ম হয়েছে, সবকিছুর মূলে রয়েছে কথিত ব্যক্তিসত্তাবোধের ধারণা, যাকে 'হিউম্যান বিয়িং' বলা যায়। আধুনিকতা, পাশ্চাত্য সভ্যতা কিংবা পুঁজিবাদী চিন্তাধারা হিউম্যান বিয়িংকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সামনে এই সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

---

[৪০] এক্ষেত্রে আলেম-সমাজেরও কিছু দুর্বলতা আছে। তারা কিছু ক্ষেত্রে ফতোয়ার স্বচ্ছতা রাখতে পারেননি। দেশের ফতোয়াবিভাগের নিয়ন্ত্রণহীন আধিক্য ও অপর্যাপ্ত গবেষণা এবং মানহীন তৎপরতা ফতোয়ার প্রভাব বজায় রাখতে পারেনি। মুসলিমদের দীনের জটিল বিষয়াদিতে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান এবং ফতোয়াকে তাদের জীবনঘনিষ্ঠ করতে ব্যর্থতার দায় তাদেরও আছে বৈ কি!

[৪১] জাদিদিয়্যত- ৩৯

যুক্তিবাদ (Rationalism)

এই যুগের সূচনা মূলত ১৭ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় থেকে আর এর শেষ ধরা হয় ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ তথা ১৭৭৫ সালকে। ১৬শ শতাব্দীতে খ্রিষ্টধর্মের বিকৃতি ও পরিবর্তনের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা মোটামুটি পূর্ণতা লাভ করে ১৭শ শতাব্দীতে এসে। এই যুগটাকে আধুনিক যুগও বলা হয়। ১৭শ শতাব্দীতে মানুষের চিন্তাভাবনা এবং জীবনধারায় এক বিশাল পরিবর্তন আসে। মানুষ নিজের সত্তাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে শুরু করে। এই পরিবর্তন প্রথমে ইউরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯শ শতাব্দীতে এসে এই পরিবর্তনের প্রভাব প্রাচ্যেও ছড়াতে থাকে।

১৭শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত মানুষ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, মানুষের সমস্ত চিন্তাভাবনা, চেষ্টাপ্রচেষ্টা হবে কেবল জড়জগৎকে কেন্দ্র করে। তার জীবনের লক্ষ্য হবে শুধু জড়জগৎকে আয়ত্ত করা। এখন প্রশ্ন হলো, এই ক্ষেত্রে মানুষ কীসের উপর নির্ভর করবে? ১৭শ শতাব্দীর পরবর্তী সময়টাতে এসে নির্ধারিত হয় যে, মানুষ কেবল আকল বা যুক্তির উপর ভরসা করতে পারে। তার সামগ্রিক দিকনির্দেশনার জন্য আকলই যথেষ্ট। কারণ এই জিনিসটা সকল মানুষের মধ্যেই রয়েছে।[৪২]

যুক্তিবাদের যুগে দুজন প্রধান দার্শনিক ছিল, যাদেরকে দর্শনের উৎস বলা হয় ইউরোপে। তারা হলো দেকার্ত আর নিউটন। এরা দুজনই ছিল ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। দেকার্ত একইসাথে ছিল ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত দার্শনিক এবং গণিতবিদ। আর নিউটন (২৫ ডিসেম্বর, ১৬৪২; ২০ মার্চ ১৭২৬-২৭) ছিল ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। দেকার্ত একজন রোমান ক্যাথলিক পাদরি হিসেবে লেখার মাধ্যমে মানুষের সন্দেহ-সংশয় দূর করার চেষ্টা চালায়। এভাবে সে খ্রিষ্টানধর্মের সেবা করে। কিন্তু সেবার নামে সে করে ফেলে বিশাল ক্ষতি। পশ্চিমাদের মানসিকতা বিকৃত করার ক্ষেত্রে তার মতো দায়িত্বশীলতার পরিচয় হয়তো আর কেউ দেয়নি। তার ব্যাপারে একজন ফরাসি রোমান ক্যাথলিকের বক্তব্য—'ফ্রান্স খোদার সাথে সবচেয়ে বড় যে পাপ করেছে, তা হলো দেকার্তকে জন্ম দেওয়া।' দেকার্তের বিখ্যাত উক্তি হলো **I think, therefore i am.** আমি চিন্তা

[৪২] তাআরুফে তাহজিবে মাগরিব

করতে পারি এজন্যই আমি 'আমি'। অর্থাৎ সে মানুষের পুরো অস্তিত্বকে আকলের উপর সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। তার কথা ছিল- এখন থেকে সমস্ত ভালো-মন্দের মাপকাঠি আকল বা যুক্তি।

নিউটনের ভ্রান্তি

এই যুগের দ্বিতীয় প্রধান দার্শনিক হলো নিউটন। তার সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো গতির সূত্রসমূহের আবিষ্কার। পাশ্চাত্যে এর গভীর প্রভাব ছড়ায়। এই সূত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে সে দেখাতে চেয়েছে, নির্দিষ্ট কিছু নিয়মের উপর পৃথিবী চলে। মানুষ যদি জ্ঞানবুদ্ধির ব্যবহার করে সেসব নিয়ম আয়ত্ত করে নিতে পারে, তা হলে সে প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। বিলম্বে হলেও সে প্রকৃতির উপর বিজয় লাভ করবে। তবে নিউটনের মত ছিল এই সব নিয়ম প্রাকৃতিক জগতে বিদ্যমান থাকা হলো সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ। কিন্তু পশ্চিমা বিজ্ঞান পরবর্তীতে এটাকে বস্তুবাদের দিকে প্রবাহিত করতে থাকে এবং তাদের মধ্যে স্রষ্টাকে চ্যালেঞ্জ করার মনোভাব চলে আসে।

আসলে এটাই বর্তমান বিজ্ঞানের স্বরূপ। আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা। তার ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করা। মানুষ বিজ্ঞানকে এখন খোদা মানে। বিজ্ঞানকে চির সত্য ও অপরাজেয় মনে করে। অথচ মানুষ ততটুকুই জানতে পারে যতটুকু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জানাতে চান।[৪৩] সূত্র আবিষ্কার তো ভালো ব্যাপার ছিল। কিন্তু তা থেকে যে ফল বের করা হলো, তা ছিল ধর্মবিশ্বাসের উপর কুঠারাঘাত।

ব্যক্তি ও সমাজের অবস্থান

যুক্তিবাদের যুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষ তাদের জীবন এবং চিন্তার জগতে সর্বোচ্চ অথরিটি দেয় সমাজকে। তাদের ধারণা—ব্যক্তির প্রতিটি কথা এবং কাজ সমাজের অনুগামী হবে। তারা ধর্মকেও ততটুকুই গ্রহণ করত, যতটুকু সমাজের সাথে খাপ খায়। মোটকথা সমাজকে তারা খোদার আসনে বসিয়ে দেয়। সমাজের মানুষেরা যা সঠিক বলবে, তাই সঠিক। আর তারা যা প্রত্যাখ্যান করবে, তা সঠিক নয়।

---

[৪৩] সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৫

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যাত হয়। সমাজের পরিবর্তে তখন ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আগে ভালো-মন্দের নীতিনির্ধারক ছিল সমাজ। অর্থাৎ প্রভুত্বের অথরিটি ছিল সমাজের। পরবর্তীকালে এই অথরিটি দেওয়া হয় ব্যক্তিকে। অবশ্য ইউরোপের বাইরে মুসলিম দেশগুলোর অনেক জায়গায় ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজের উক্ত অবস্থান এখনো রয়েছে। সমাজ কী বলবে! সমাজ ভালো বলবে না- এসব কথার আড়ালে এখনো অনেক ইসলামি বিধান প্রত্যাখ্যান করা হয়।

মোটকথা, ইউরোপ সত্য-মিথ্যা, নৈতিকতা নিরূপণের ক্ষেত্রে সমাজকে সর্বোচ্চ অথরিটি দান করুক কিংবা ব্যক্তিকে, উভয় দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দু একই—মানববাদ। উভয় ক্ষেত্রেই তারা মানুষকে সর্বোচ্চ অথরিটি দিচ্ছে, রবের আসনে বসাচ্ছে।[৪৪]

ফরাসি বিপ্লব

১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই ফ্রান্সের প্যারিসের কুখ্যাত বাস্তিলে বিক্ষোভ হয়। এই বাস্তিল দুর্গের পতনের মধ্য দিয়ে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়। ফরাসি বিপ্লবকে ইউরোপের ইতিহাসে আলাদা মর্যাদা দেওয়ার প্রধান কারণ হলো, এই বিপ্লবের মাধ্যমে ফ্রান্সে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের অগ্রযাত্রা শুরু হয় এবং একইসাথে দেশের রোমান ক্যাথলিক চার্চ ধর্মীয় কর্তৃত্ব ত্যাগ করে মানুষকে ব্যক্তিস্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। তা ছাড়া এই বিপ্লব পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান ছিল স্বাধীনতা, সমতা এবং এর ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব (Liberty-Equality-Fraternity)। জুলুম থেকে মুক্তির দাবি অবশ্যই ন্যায্য। তবে যে স্লোগান এবং যে ধরনের মুক্তির দাবি এই বিপ্লবে করা হয়েছিল, তার সাথে ইসলাম তথা ন্যায়ের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ইসলামের ভ্রাতৃত্ব হয় আল্লাহর জন্য। আর এখানে ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি ছিল পশ্চিমা স্বাধীনতা ও সমতা, যার বাস্তবতা হলো, ধর্মকে ত্যাগ করা।[৪৫] এই বিপ্লবকে স্মরণ করা হয় গণতন্ত্রের বিজয় হিসেবে।

---

[৪৪] তাআরুফে তাহজিবে মাগরিব- ৮৯-৯০

[৪৫] কেন এই স্বাধীনতার দাবি ধর্মহীনতা তা নিয়ে সামনে বিশদ আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ

ফরাসি বিপ্লবের পেছনে মূলত দুটি বিপরীতমুখী দর্শন কাজ করেছে। এক হলো ভলতেয়ারের যুক্তিবাদ দর্শন। আরেক হলো রুশোর প্রকৃতিবাদ দর্শন।[৪৬]

ঊনবিংশ শতাব্দী

ঊনবিংশ শতাব্দী পাশ্চাত্য সভ্যতার জাগতিক উন্নতির অন্যতম প্রধান অংশ। এই শতাব্দীর একটি জটিলতা হলো, কেউ কেউ একে শিল্পবিপ্লবের যুগ বলে, আবার কেউ কেউ বিজ্ঞানের যুগ বলে। দীনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সংশয়-সন্দেহ এই শতাব্দীতেই সৃষ্টি হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রায় চূড়ান্ত হয়ে যায় যে, ইন্দ্রিয় ও জড়জগতের ঊর্ধ্বে ধর্মের কোনো অবস্থান নেই। বস্তুজগৎই সবকিছুর মূল।[৪৭] এটাকে বলা হলো Naturalism. এই শতাব্দীতে সৃষ্ট কিছু দর্শন হলো:

এক. liberal ethics-(লিবারেল মূল্যবোধ): ইতোপূর্বে মানুষের চারিত্রিক ও নৈতিকতার ভিত্তি ছিল ধর্ম। চরিত্রকে ধর্মের একটি অনুষদ বিবেচনা করা হতো। কিন্তু ১৮শ শতাব্দীতে ধর্মকে সরিয়ে আকলকে চারিত্রিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালানো হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে এই প্রচেষ্টা পূর্ণতা লাভ করে। এখন চরিত্র কিংবা নৈতিকতাকে ধর্ম থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে, যেমন পৃথক করা হয়েছে রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে। মানুষ বলতে শুরু করেছে, জান্নাতের লোভে কিংবা জাহান্নামের ভয়ে যে কাজ করা হয়, তা নেক কাজ নয়; বরং ভালো কাজ তো তা-ই, যার মাধ্যমে সে খুশি হয়। মানুষের ফিতরাত পবিত্র। সে নিজেই উত্তম চারিত্রিক কাঠামো ও ভিত্তি নির্মাণের ব্যাপারে যথেষ্ট। চরিত্র ধর্মের কোনো বিষয় নয়। ফলে এর চিহ্নিতকরণে ধর্মের কোনো প্রয়োজন নেই।[৪৮]

মূলত এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আরো কিছু ইজম ও প্রবণতা দেখা দেয়। Utilitarianism-ও (উপযোগবাদ) এই দৃষ্টিভঙ্গির ফল। উপযোগবাদ হলো একটি নৈতিক তত্ত্ব, যা কেবল সুখ বা পরিতৃপ্তিকে উৎসাহিত করে

---

[৪৬] জাদিদিয়্যাত- ৫৬-৫৯

[৪৭] তাআরুফ- ৯১

[৪৮] জাদিদিয়্যাত- ৬৬

এবং এমন ক্রিয়াকলাপকে প্রত্যাখ্যান করে, যা মানুষের আপাত-সন্তুষ্টি বা সুখের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়; যদিও তা হয় ধর্মীয় কোনো নিয়ম, আদেশ বা নিষেধ। এর আরেক দিক হলো, ভালো-মন্দ কোনো জিনিসের সত্তাগত গুণ নয়। এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে এবং ইসলামও এর সমর্থন করে; কিন্তু সমস্যা হলো পরবর্তী অংশ নিয়ে। ইসলামে যেকোনো কিছুর ভালো-মন্দের বৈশিষ্ট্য শরিয়তপ্রদত্ত। শরিয়ত যা ভালো বলেছে, তা-ই ভালো আর শরিয়ত যা খারাপ বলেছে, তা-ই খারাপ। অর্থাৎ ভালো-মন্দের মাপকাঠি একমাত্র শরিয়ত। আর Utilitarianism এর বক্তব্য হলো, যে জিনিস (বস্তুজগৎ মানবীয় দৃষ্টিতে) মানুষের জন্য উপকারী হবে, তাই ভালো। আর যা তার জন্য উপকারী নয়, তা-ই মন্দ। ভালো-মন্দের মাপকাঠি হলো মানুষের নিজের দৃষ্টিতে এর সাধারণ উপকারিতা। liberal Ethics দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আকিদা ও ইবাদতকে অনর্থক মনে করার প্রবণতা তৈরি হয়। রোমান ক্যাথলিকরা আকিদাকে Dogmas বলে তাচ্ছিল্য করত। বর্তমানেও অনেক মডারেট মুসলিম আকিদাকে অনর্থক হিসেবে বিচার করে।

এই সময়ে ইবাদতকে প্রথা বা রুসুম মনে করার প্রবণতা বাড়তে থাকে। মানুষ বলতে শুরু করে, আল্লাহর ইবাদতের জন্য বিশেষ কোনো ধরন ও পদ্ধতির দরকার নেই। নিষ্ঠা থাকলেই হলো। এটাই ধর্মের মূল কথা। মোটকথা, মানবীয় এমন প্রান্তিক নৈতিকতা, যার কোনো ভিত্তি নেই, তা-ই ধর্মের স্থান দখল করে নেয়।[৪৯]

দুই. মুক্তচিন্তা (free thought): মুক্তচিন্তার লক্ষ্যই হলো প্রকাশ্যে ধর্মের বিরোধিতা করা কিংবা ধর্মের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইনের বিবর্তনবাদ মুক্তচিন্তাকে প্রচণ্ডভাবে উসকে দেয়। সেই সময়ই বিবর্তনবাদের পক্ষে শক্ত কোনো প্রমাণ ছিল না এবং আজ পর্যন্ত কেউ তা হাজির করতে পারেনি। বরং বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানজগৎ থেকেই চরমভাবে এর বিরোধিতা দেখা যাচ্ছে। তবে বিবর্তনবাদের প্রভাব এখনো রয়ে গেছে। এমনকি বর্তমানে পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যই এই দর্শনে বেশি মোহগ্রস্ত হয়ে আছে।[৫০]

---

[৪৯] জাদিদিয়্যাত- ৬৭-৬৮

[৫০] বিবর্তন বিষয়ে বিস্তারিত জানতে রাফান আহমাদ-এর 'হোমো স্যাফিয়েন্স রিলেটিং আওয়ার হিস্টোরি' বইটি পড়ুন।

তিন. প্রাচ্যবাদ; ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই মূলত প্রাচ্যবিদদের আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৮শ শতাব্দীতে প্রাচ্যের দীন ও ইলমের ব্যাপারে পশ্চিমারা অধ্যয়ন এবং লেখনী ধারণ শুরু করলেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসেই তা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে রূপ নেয়। কারণ তখন রাজনৈতিকভাবেই তাদের জন্য এটা দরকারি হয়ে দাঁড়ায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমাবিশ্ব প্রাচ্যের দেশগুলোতে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল। তখন বিজিত জাতির দীন ও জ্ঞান সম্পর্কে অধ্যয়ন জরুরি হয়ে পড়ে তাদেরকে পরিচালনা করার জন্য। তবে এই কারণ ছাড়াও প্রাচ্যবিদদের পক্ষে মূল ভূমিকা পালন করেছিল সেসব দর্শন ও প্রবণতা, যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে অস্তিত্ব লাভ করে। যেমন: মুক্তচিন্তা, হিস্টোরিজম (Historism), তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পাঠ ইত্যাদি।[৫১]

প্রাচ্যবাদ থেকে জন্ম নেওয়া প্রধান প্রধান সমস্যা হলো -

১- দীনি শিক্ষা অর্জন করার ক্ষেত্রে তার ঐতিহ্যবাহী ধারা তথা সিনা থেকে সিনা ইলম অর্জনের পদ্ধতিকে গুরুত্বহীন মনে করা।

২- ধারাবাহিকসূত্রে প্রাপ্ত দীনের ব্যাখ্যাসমূহ পরিত্যাগ করে নিজস্ব মতের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা প্রদান করা।

৩- দীনের সব জায়গায় পাশ্চাত্য চিন্তা ও পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানের ধারণা খোঁজা এবং দীনের এমন উপাদানকেই প্রাধান্য দেওয়া, যেখানে পাশ্চাত্য আধুনিকতার বাহ্যিক রঙ দেখা যায়।[৫২]

৪- Positivism এই ইজমের জনক হলো অগাস্ট কোঁৎ। যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুমান করা যাবে, তা-ই বাস্তব। এর বাইরে কোনো বাস্তবতা নেই। এমন প্রবণতা এর আগেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু অগাস্ট কোঁৎ এটাকে নিয়মতান্ত্রিক দর্শনে রূপ দান করে। স্পষ্টতই এই দর্শন আল্লাহ, ওহি এবং দীন অস্বীকার করে। এই বিশ্বাস যখন বিংশ শতাব্দীতে প্রবল আকার ধারণ করে, তখন ধর্মকে সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। সবকিছুকে বিজ্ঞান দিয়ে বিচার করার প্রবণতা চালু হয়।

---

[৫১] জাদিদিয়্যত- ৭২

[৫২] জাদিদিয়্যত- ৭২

৫- Historicalism (ইতিহাসবাদ) এর উদ্দেশ্য হলো, ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূলনীতির ভিত্তিতে কোনো কিছুর শুদ্ধাশুদ্ধির হুকুম প্রয়োগ করা যাবে না।[৫৩] বরং প্রচলিত ইতিহাস দেখে কোন জিনিসের ধরন, প্রভাব ও অবস্থান কীরূপ হবে তার বিচার করতে হবে। এই প্রবণতা মুসলিমদের দীন বিনষ্ট ও তাদেরকে বিভ্রান্ত করার পেছনে শক্ত ভূমিকা রেখেছে। প্রাচ্যবিদদের জঘন্য কর্মের পেছনে ইতিহাসপাঠের এই নতুন পদ্ধতি অনেক প্রভাব ফেলেছে।[৫৪]

ইতিহাসের ঘটনাবলি কেবল ফ্যাক্ট। এগুলোকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যায়; দলিল কিংবা বিধান সাব্যস্তকারী হিসেবে নয়। কুরআন-সুন্নাহ আশ্রিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের ঘটনা ছাড়া নিঃশর্তভাবে কোনো ঘটনা দলিল হতে পারে না। ইসলামে ইতিহাসপাঠের আলাদা রীতি আছে। এর শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য রয়েছে বিভিন্ন উসুল ও মূলনীতি। ইতিহাসকে আমাদের সেই নীতির আলোকেই পাঠ করতে হবে।[৫৫]

প্রাচ্যবিদরা যেসব প্রবণতা ও দর্শনে প্রভাবিত হয়ে ইতিহাস পাঠ করে, সেগুলো কখনোই নিরপেক্ষ নয়। তা ছাড়া এসব প্রবণতার সাথে ইসলামের মৌলিক সংঘর্ষ বিদ্যমান। এইসব প্রবণতা তাদের মস্তিষ্কই বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে তাদের ইতিহাসচর্চায় অবধারিতভাবেই নিষ্ঠার কোনো ঠাঁই নেই। কোনো মুসলিমের উচিত নয় প্রাচ্যবিদদের ইতিহাস ও ইতিহাসপাঠের মূলনীতি গ্রহণ করা। এটা নিশ্চিতভাবেই তাকে দীনের ব্যাপারে সংশয়গ্রস্ত করবে এবং সে তথ্যসন্ত্রাসের শিকার হবে।

তুলনামূলক ধর্মপাঠ

এই তুলনামূলক ধর্মপাঠের উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, সত্য-মিথ্যা পর্যন্ত পৌঁছা। বরং ধর্মের ভেতরে পরস্পর কোন কোন মিল ও সাদৃশ্য রয়েছে,

---

[৫৩] যেমন কুরআনুল কারিমে বর্ণিত বাইতুল্লাহ নির্মাণ বা নুহ আলাইহিস সালামের যুগের প্লাবন ও পরবর্তী পৃথিবীসংক্রান্ত বিশ্বাসগুলো। ইতিহাসবাদ যতক্ষণ না তাদের থিওরিটিক্যাল পদ্ধতিতে ঐতিহাসিকভাবে বিষয়গুলো প্রমাণ করতে পারছে, ততক্ষণ তারা এগুলোকে বিশ্বাস করবে না। মুসলিমদের জন্য এটা সুস্পষ্ট কুফর।

[৫৪] জাদিদিয়্যাত- ৬৩

[৫৫] বিস্তারিতে জানতে দেখুন ইমরান রাইহান-এর 'ইতিহাস পাঠ প্রসঙ্গ কথা'।

সেগুলো খুঁজে বের করাই ছিল এর প্রধান লক্ষ। নিশ্চিতভাবেই এটা একটা অনর্থক কাজ। এর মাধ্যমে দীনের স্বকীয়তা বিনষ্ট হয়। বিশেষত ইসলামের সাথে অন্য ধর্মের মিল অমিল—এ বিষয়ে ইসলামের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, সুরা আলে ইমরানের যে আয়াতে বলা হয়েছে- 'বলুন, হে আহলে কিতাবগণ, একটি বিষয়ের দিকে এসো, যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান;' -এর অর্থ তা হলে কী?

বিখ্যাত মুফাসসির আবু বকর জাসসাস রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এখানে ধর্মের ভিত্তিতে মিল অমিল খোঁজার কথা বলা হয়নি। বরং ব্যক্তি ও মানুষের সৃষ্টিগত সূত্র হিসেবে মিল খুঁজতে বলা হয়েছে। মানুষের সৃষ্টিগত মিল এইখানে যে, সকল মানুষ আল্লাহর বান্দা। সুতরাং মানুষের উচিত আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা। আয়াতের পরবর্তী অংশ এটাই নির্দেশ করে।[৫৬]

উপনিবেশবাদ (colonialism)

পাশ্চাত্যের জন্য উপনিবেশবাদের সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশ্চাত্যের উন্নতি-অগ্রগতি সবকিছুর মূল সূত্র হলো উপনিবেশবাদ। উপনিবেশবাদের প্রধান শক্তি ছিল সামরিক, অর্থনৈতিক ও গির্জাবাদ। গির্জাবাদের কাজ ছিল অধীনস্থদের উপর এই আগ্রাসনের পক্ষে যুক্তি ও তত্ত্ব পেশ করা। পাশ্চাত্য যেখানেই গিয়েছে, এই তিন শক্তি সাথে নিয়ে গেছে এবং স্থানীয় সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিগুলো কব্জা করে নিয়েছে কিংবা ধ্বংস করে ফেলেছে। আমাদের উপর উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠা করে আমাদের সমস্ত সম্পত্তি লুটে নিয়ে গেছে পাশ্চাত্যে। সেখানে তারা আমাদেরই সম্পত্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে বড় বড় কলকারখানা আর গবেষণাগার। তার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর সূত্রও এই উপনিবেশবাদ।

আপনি যদি মুসলিম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর সময়ের দিকে খেয়াল করেন, তা হলে দেখবেন সেগুলো হয়েছে ইসলামি সাম্রাজ্যের সময়কালে। সভ্যতার প্রতিষ্ঠার জন্য আদর্শের পর সামরিক শক্তির কোনো বিকল্প নেই। এজন্যই ইসলামে ই'দাদ তথা সামরিক প্রস্তুতিকে ব্যাপকার্থে ওয়াজিব রাখা হয়েছে। একটি সভ্যতা প্রতিষ্ঠার পর তার বিকাশ ও টিকে

---

[৫৬] আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস- ২/২৯৬

থাকার লড়াইয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের ভূমিকা অনেকখানি; তবে জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নতি সাধন বিজয়ের সূত্র না, বরং বিজয়ের ফলমাত্র।

আমরা মনে করি পাশ্চাত্য দুনিয়া স্বাধীনতা, সমতা ও জ্ঞানবিজ্ঞান দিয়ে এতো উন্নতি করেছে। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। পাশ্চাত্যের উন্নতির প্রধান ইতিহাস হলো উপনিবেশবাদ ও লুটপাট। বিজ্ঞান ও গবেষণাগারের জন্য যে অর্থ-বরাদ্দ প্রয়োজন, উপনিবেশবাদ সেই অর্থের মূল যোগানদাতা।[৫৭] মুসলিম সভ্যতার বিকাশে ইবনে হাইসাম, ফারাবিসহ অন্যান্য বিজ্ঞানীর ভূমিকা ও অবদান রয়েছে; কিন্তু আমাদের দীনের বিজয় এসেছে সালাহুদ্দীন আইয়ুবি, তারেক বিন জিয়াদের মতো মহান মুজাহিদদের হাত ধরে। তাদের বিপ্লবী আদর্শ, ইখলাস ও পবিত্র জিহাদের মাধ্যমে। আমরা অনেক সময় অবজ্ঞা করে বলি, বর্তমানে কেন কোনো মুসলিম বিজ্ঞানীর জন্ম হচ্ছে না! আমরা দৃঢ়তার সাথেই বলব, যতদিন উম্মতের মাঝে খালেদ বিন ওয়ালিদ, সালাহুদ্দীন আইয়ুবি, মুসা বিন নুসাইর, তারেক বিন জিয়াদদের জন্ম না হবে ততদিন উম্মতের মধ্য থেকে ফারাবি, ইবনে হাইসামরাও বেরিয়ে আসবে না। আজও মুসলিমদের সেই মেধা আছে; কিন্তু তা গোলামি করে পাশ্চাত্যের, বিক্রি হয়ে যায় পশ্চিমের কাছে অথবা পশ্চিমারা তা সহজেই হাত করে নেয়। মানুষ প্রশ্ন করে আজ মুসলিমদের বিজ্ঞান নেই, মিডিয়া নেই এজন্য মুসলিমরা পরাজিত। কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে খেলাফত হারানোর পর

---

[৫৭] William Digby নামের এক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক-কাম-রাজনীতিবিদ লিখেছেন, 'পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার সম্পদ স্রোতের মতো এসে জমা হতে থাকে লন্ডনে। ১৭৬০ সালের আগে যেখানে শিল্পকারখানার নামগন্ধও ছিল না, সেখানে হাজার হাজার শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে (শিল্পবিপ্লব)।' [Prosperous' British India, Sir William Digby, ১৯০১]

লর্ড ম্যাকলে লিখেছেন, 'ইংল্যান্ডে সম্পদ আসত সমুদ্রপথে। ওয়াট ও অন্যান্যের আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ইংল্যান্ডের যতটুকু কমতি ছিল, ইন্ডিয়া তা সরবরাহ করেছে। ইংল্যান্ডের পুঁজি বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সম্পদের প্রবেশ। ...শিল্পবিপ্লব, যার উপর ভিত্তি করে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, তা সম্ভব হয়েছিল কেবল ইন্ডিয়ার সম্পদের কারণে, যা লোন ছিল না, এমনিতেই নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তা না হলে ইংল্যান্ডের স্টিম ইঞ্জিন ও যন্ত্রশিল্প পড়েই থাকত। ইংল্যান্ডের উন্নতি মানে ভারতের লোকসান— এমনই লোকসান, যা ভারতীয় শিল্পকে ফাঁকা করে দিয়েছিল, কৃষিকে স্থবির করে দিয়েছিল। যেকোনো দেশের সম্পদ যদি এভাবে পাচার হয়, সে ধনী-সম্পদশালী হলেও নিঃস্ব হয়ে যাবে।' [Unhappy India, Lala Lajpat Rai, 1928]

মুসলিমরা নানাভাবেই এ বিষয়গুলোতে উন্নতি করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পশ্চিমা শাসন, সামরিক শক্তি ও ফ্যাসিবাদ এগুলোকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দিয়েছে। খেলাফতবিহীন বিগত একশত বছরে হাজারো মুসলিম আলেম ও বিজ্ঞানী গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছে কিংবা বছরের পর বছর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নির্যাতিত হয়েছে। কাজেই বিজ্ঞান ও মিডিয়ায় উন্নতি হলেই মুসলিমরা উন্নতি করবে মৌলিকভাবে এই ধারণা শুদ্ধ নয়। বরং মূল বিষয় হলো ক্ষমতা। মুসলিম সামরিক শক্তি ইসলামের পক্ষে ব্যবহৃত হলে বিজ্ঞান ও মিডিয়ায় উন্নতি সময়ের ব্যাপার মাত্র।

আমরা আক্ষরিক অর্থে পাশ্চাত্যের শারীরিক উপনিবেশবাদ থেকে মুক্ত হলেও তারা আজ অবধি আমাদের উপর চিন্তাগত উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। আমাদের জন্য এটা খুবই ভয়াবহ এবং লজ্জাজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এখন যা চিন্তা করি, পাশ্চাত্যের মতোই করি। এর বাইরে চিন্তার অনুমতি নেই।[৫৮] এজন্য ইসলামের সংজ্ঞায়িত ইনসাফের চিন্তা আমাদের কাছে অপরিচিত মনে হয়। আমাদের অন্তঃকরণ তা কবুল করে না। মোটকথা, চিন্তাগত দিক থেকে তারা আমাদের ফিতরাত বদলে দিয়েছে। উপনিবেশবাদের সময় তারা আমাদের ও তাদের মাঝে একটা বাইনারি স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করেছে যে তারা সভ্য, আমরা অসভ্য। তারা শিক্ষিত, আমরা মূর্খ। তারা সাদা, আমরা কালো। এই তত্ত্বগুলো আমাদের মস্তিষ্কে এমনভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আমরা এখন সভ্য ও শিক্ষিত হওয়ার জন্য সব জায়গায় তাদেরকেই মানদণ্ড মানি। ফলে মানবতাবোধ, ইনসাফ ও নৈতিক মূল্যবোধের কথা চিন্তা করলে তাদের কথাই আমাদের মনে হয়, যারা পুরো মুসলিমবিশ্বকে রক্তের মানচিত্র বানিয়ে রেখেছে।

আমাদের উপর চিন্তাগত উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠা করতে প্রধান ভূমিকা রাখছে পাশ্চাত্যের শিক্ষাধারা ও তাদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়াগুলো। উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠা করার পরপরই পশ্চিমারা স্থানীয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলো

---

[৫৮] এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন আসিফ আদনান-এর 'চিন্তাপরাধ'।

ধ্বংস করে ফেলে।[৫৯] আর তাদের শিক্ষাধারা এখানে স্থানান্তর করে। আজও আমাদের পুরো শিক্ষাব্যবস্থা পাশ্চাত্য কারিকুলামে সাজানো। সিলেবাসে অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয়ও প্রয়োজন দেখিয়ে দাখিল করা হয়েছে। অবশ্যই এগুলো পর্যালোচনার দাবি রাখে। শিক্ষার নামে শিক্ষার্থীদের শেখানো হচ্ছে পাশ্চাত্যের গোলামি। জাতির নিজস্ব মেধা ও নৈতিক শক্তি অর্জনের প্রধান ক্ষেত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমনই এক কারিকুলামে সাজানো, যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা বের হয় পাশ্চাত্যের মানসিক দাস হয়ে। এই মানসিক দাসেরা দেশের প্রতিটি সেক্টরকেই পশ্চিমাদের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান বানিয়ে রাখে।

মিডিয়া আমাদের শেখাচ্ছে কীভাবে পাশ্চাত্যের গোলাম হতে হয় এবং কেন তাদের দাসত্ব বরণ করা আমাদের জন্য জরুরি। পাশ্চাত্যের চিন্তাচেতনা খুব সচেতনভাবে ধীরে ধীরে তারা আমাদের মধ্যে পুশ করে যাচ্ছে। তাই ব্যাপারটা আমাদের চোখে সরাসরি ধরা পড়ে না। পাশ্চাত্য

---

[৫৯] ইংরেজরা সুবে বাংলার খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পেয়ে লক্ষ করে যে ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় ৮০ হাজার মকতব ও মাদরাসা ছিল। এই ৮০ হাজার মকতব, মাদরাসা ও খানকার জন্য বাংলার চারভাগের একভাগ জমি লাখেরাজভাবে বরাদ্দ ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমেই এই লাখেরাজ সম্পত্তি আইন, বিধানপ্রণয়ন ও জোরজবরদস্তি করে দেশের হিন্দু জমিদার ও প্রজাদের ইজারা দিতে থাকে। এ-সংক্রান্ত তিনটি বিধান হলো : (১) ১৭৯৩ সালের রেগুলেশন—১৯, (২) ১৯১৮ সালের রেগুলেশন—২, (৩) রিজাম্পসান ল' অব ১৮২৮ (লাখেরাজ ভূমি পুনঃগ্রহণ আইন)। ফলে মাদরাসার আয় কমতে থাকে। বহু মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৬৫ সালে বাংলায় মাদরাসার সংখ্যা ছিল আশি হাজার (Max Muller)। ২০০ বছর পর ১৯৬৫ সালে এ সংখ্যা দুই হাজারের নিচে নেমে আসে।' (এজেডএম শামসুল আলম, মাদ্রাসা শিক্ষা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, চট্টগ্রাম-ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ : মে-২০০২, পৃ. ৩-৪)

'এ দেশটা আমাদের হুকুমতে আসার আগে মুসলমানরা শুধু শাসন ব্যাপারেই নয়, শিক্ষা ক্ষেত্রেও ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল। ভারতের যে প্রসিদ্ধ (ইংরেজ) রাষ্ট্রনেতা তাদের ভালোভাবে জানেন, তার কথায় : ভারতীয় মুসলমানদের এমন একটা শিক্ষাপ্রণালি ছিল, যা আমাদের আমদানি-করা প্রণালির চেয়ে নিম্নমানের হলেও কোনোক্রমেই ঘৃণার যোগ্য ছিল না। তার দ্বারা উচ্চস্তরের জ্ঞান বিকাশ ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিচ্ছন্ন হতো। সেটা পুরোনো ছাঁচের হলেও তার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় ছিল এবং সেকালের অন্যসব প্রণালির চেয়ে নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট ছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থাতেই তারা মানসিক ও আর্থিক প্রাধান্য সহজেই অধিকার করেছিল।' (উইলিয়াম হান্টার, ইন্ডিয়ান মুসলমানস, পৃষ্ঠা-১১৬)

শিক্ষাকেন্দ্র আর বৈশ্বিক মিডিয়া হলো দাস তৈরির কারখানা। এর মাধ্যমে তারা তৈরি করছে নিজেদের সেবাদাস, যৌনদাস ইত্যাদি।

স্থানীয় শিক্ষাকেন্দ্র ধ্বংসের পাশাপাশি উপনিবেশবাদের সময় পশ্চিমারা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর ধ্বংস করে। স্থানীয় শিল্পখাতও তারা বিনাশ করে ফেলে।[৬০] ইংরেজরা স্বাধীনভাবে রেশমের কাপড় উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এখানে কেবল রেশমের কাচামাল উৎপাদনের অনুমতি দেওয়া হয়। কাপড় তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় ইংরেজ কোম্পানিগুলোকে। তারপর কোম্পানিগুলো রেশমের কাপড় উৎপাদন করে ভারতবর্ষে রফতানি করে। এভাবে তারা ভারতবর্ষের শিল্পকারখানা ধ্বংস করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ফলে মানুষ স্বাধীন শিল্প-উৎপাদন ছেড়ে দিয়ে ইংরেজদের কারখানায় কাজ করতে বাধ্য হয় অথবা তাদেরকে কাজ করতে বাধ্য করা হয়।[৬১]

বিংশ শতাব্দী

হাসান আসকারি রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিংশ শতাব্দী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল সময়। এই শতাব্দীতে বিমান, রেডিও, টেলিভিশন, এটমবোমা, হাইড্রোজেন বোমা, আধুনিক যানবাহনসহ অনেককিছু আবিষ্কার করেছে পশ্চিমারা। এর মাধ্যমে তারা বিশ্ববাসীকে নিজেদের উন্নতি এবং শক্তি প্রদর্শন করেছে। তারা দেখিয়েছে যে পশ্চিমাদের কাছে নফস শান্ত করার জন্য কত উপাদান রয়েছে এবং নিজেদের খায়েশ পূরণ করার জন্য তারা কত কিছু আবিষ্কার করেছে। প্রথমত ঊনবিংশ শতাব্দীর উপনিবেশবাদ তারপর বিংশ শতাব্দীর অভূতপূর্ব সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রাচ্যবাসীদেব চেতনাকে প্রভাবিত করে। তারা পশ্চিমা নীতির অন্ধ অনুকরণ শুরু করে। এভাবে খুব দ্রুত প্রচ্যের দেশগুলোও পাশ্চাত্য দেশে পরিণত হতে থাকে।

---

[৬০] লর্ড ম্যাকলে লিখেছেন, 'ইংল্যান্ডের উন্নতি মানে ভারতের লোকসান— এমনই লোকসান, যা ভারতীয় শিল্পকে ফাঁকা করে দিয়েছিল, কৃষিকে স্থবির করে দিয়েছিল। যেকোনো দেশ যদি এইভাবে পাচার করা হয়, সে ধনী-সম্পদশালী হলেও নিঃস্ব হয়ে যাবে।' [Unhappy India, Lala Lajpat Rai, ১৯২৮]

[৬১] বারতানি সামরাজ নে হামে ক্যয়সে লোটা; সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানি; ১০৮

পাশ্চাত্যের ভূত তাদের মন-মগজে এতো শক্তভাবে বাসা বেঁধে নেয় যে, তারা নিজেদের রীতি-নীতি ও বিশ্বাসকে সেকেলে ভাবতে থাকে। ক্রমান্বয়ে পাশ্চাত্য সভ্যত' ্ার সমস্ত মন্দ বিষয় নিয়ে প্রাচ্যে স্থানান্তরিত হওয়া শুরু করে। তরুণ-তরুণীদের মনন-মগজ পশ্চিমের বস্তুগত উন্নতি এতোটাই প্রভাবিত করে যে, তারা নিজেদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বর্জন করা আরম্ভ করে।

বিংশ শতাব্দী জটিল হওয়ার কারণ হলো, পাশ্চাত্য সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসের সমস্ত মতবাদ, প্রবণতা এবং চিন্তাধারা পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীতে একত্রে জড়ো হয়েছে। যেন এক ব্যক্তির মাঝে একই সময়ে নানামুখী প্রবণতা কাজ করছে। সে একবার ডানে যায়, আরেকবার বামে। কিন্তু সিরাতে মুসতাকিমের উপর চলা কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। সম্ভবত এ কারণেই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ফেতনা আমাদের সামনে আসছে। এক ফেতনার বিরুদ্ধে স্লোগান তুলতে না তুলতেই চলে আসছে আরেক ফেতনা, আরেক ব্যাধি, আরেক ইস্যু। ইস্যুর পর ইস্যু। কিন্তু মূল সমস্যা একটাই— পাশ্চাত্য সভ্যতা।[৬২]

[৬২] জাদিদিয়্যত এবং তাআরুফে তাহজিবে মাগরিব থেকে ইউরোপের ইতিহাসকে সংক্ষিপ্তভাবে সাজানো হয়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্টি

সভ্যতা শব্দটি সংস্কৃতি থেকেও ব্যাপক। আমরা অনেক সময় সংস্কৃতিকে সভ্যতা মনে করে বসি। কোনো বিশেষ বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনা থেকে যেই কর্মকাণ্ড প্রকাশ পায়, তা হলো সংস্কৃতি। আর যেসব তত্ত্বের মাধ্যমে এইসব বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তা হলো দৃষ্টিভঙ্গি। আর এই সম্পূর্ণ বিষয়টা মিলে তৈরি হয় একটি সভ্যতা। ইসলামি পরিভাষায় বললে ঈমান, আকিদা, ইবাদত, সুন্নাত এবং মুআমালাত এই সব মিলিয়ে হবে ইসলামি সভ্যতা।

কোনো রাষ্ট্রে ইসলামি আকিদা ও বিশ্বাস আদর্শগতভাবে এবং সাংবিধানিকভাবে কার্যকর ও প্রতিষ্ঠিত থাকলে, তাকে ইসলামি ইমারাহ বলা হয়। আবার ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলো পোষণ করে ব্যক্তি মুমিন হয় আর তা অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করে সে কাফের হয়। ঠিক একই ব্যাপার পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্ষেত্রে। পশ্চিমাবিশ্ব এখন নির্দিষ্ট কোনো ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ নেই। যেসব ভূখণ্ড পাশ্চাত্যের মৌলিক আকিদা মেনে নিয়েছে, সেগুলো পাশ্চাত্য বিশ্বেরই অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে যেসব ব্যক্তি পাশ্চাত্যের মৌলিক আকিদাকে আদর্শিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে, তারা পাশ্চাত্যের সদস্য হয়ে পড়েছে। প্রাচ্যে বসেও তারা পাশ্চাত্য।

পাশ্চাত্যের মৌলিক আকিদা না জানা কিংবা না বুঝার কারণে আমরা আদর্শগতভাবে নানান সমস্যার শিকার হচ্ছি। পাশ্চাত্যের ভিত্তির ব্যাপারে জ্ঞান ও অনুধাবনশূন্যতার ফলে তাকে অপরাজেয় মেনে নিয়েছি। নিজেদের জ্ঞান-তত্ত্বে এক লাঞ্ছনাকর আপস-নীতি অবলম্বন করে যাচ্ছি আর একেই পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবিলা মনে করে স্বপ্নের স্বর্গে বাস করছি। এই আপস-নীতি দিন দিন আমাদের আরো আপসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বহু যুগ ধরে এই নীতি মেনে আসার দরুন এখন তার

দীর্ঘমেয়াদি ফল ভোগ করছি। আমাদের এই এপ্রোচ পরিত্যাগ করতে হবে। এজন্য সর্বপ্রথম আমাদের পাশ্চাত্যের মৌলিক আকিদা স্পষ্টরূপে বুঝে নিতে হবে ইসলামের ট্রাডিশনাল অবস্থান থেকে। তারপর তাদের আকিদার উপর আঘাত জানতে হবে। কারণ সভ্যতার জয়-পরাজয় তার আদর্শ ও দর্শনের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে।

গ্রিক-দর্শনসহ প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে যেসব সভ্যতার উত্থান-পতন হয়েছে, মোটাদাগে সেগুলোকে তিন ভাগ করা যায়— ইন্দ্রিয়নির্ভর সভ্যতা, বুদ্ধিবৃত্তিক সভ্যতা এবং প্রত্যক্ষবাদী সভ্যতা। আবার এই তিন সভ্যতার দাফনস্থল থেকেই পশ্চিমা সভ্যতার জন্ম। ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমা শেষে যে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার সৃষ্টি, এখন আমাদের সে দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। ইতিহাসের নির্যাস থেকে যে বিষয়টা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তা হলো এই নতুন পশ্চিমা সভ্যতা মৌলিকভাবে তিনটি বিশ্বাস ও আকিদার উপর প্রতিষ্ঠিত, যা প্রাচীন জাহেলি সভ্যতাগুলোরই ভিন্ন রূপমাত্র। সেগুলো হলো—

(১) স্বাধীনতা

(২) সমতা

(৩) এবং উন্নতি।

এবার আমরা ধীরে ধীরে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

১.১ স্বাধীনতা

পাশ্চাত্য সভ্যতায় স্বাধীনতার অর্থ হলো, ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার দায়িত্ব নেওয়া ব্যক্তির অধিকার। Right to define good and bad. অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষেরই ক্ষমতা রয়েছে সে নিজের ভালো-মন্দ নির্ধারণ করবে।[৬৩] প্রকৃত কল্যাণ এটাই যে, মানুষ নিজে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার

---

[৬৩] Values are not recognaized by you, values are determined by you. সে-ই স্বাধীন 'ব্যক্তি', যে নৈতিকতার স্রষ্টা, নিজের নৈতিকতা নিজেই ঠিক করে (creator of values)। (The Human Person in Contemporary Philosophy, Frederick C. Copleston; PHILOSOPHY; Vol. 25, No. 92 (Jan., 1950), pp. 3-19)

ক্ষমতা রাখবে। (Good is the right of individual)[৬৪] আমি যা ইচ্ছা তাই করব এবং যেই পদ্ধতি পছন্দ সেই পদ্ধতিতেই করব। (তবে এর সীমানা আছে, common good নামে একটা কথা আছে) কোনো অথরিটির কাছে এই ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাসিত নই; সেই অথরিটি বংশ হোক কিংবা মা-বাবা কিংবা হোক খোদা। তার মানে প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে- সে যা ভালো মনে করবে, তা করতে পারবে। সমকামিতাকে ভালো মনে করলে সে তাও করতে পারবে। পুরুষকে বিবাহ করবে নাকি মহিলাকে, এটা চয়েজ করার ক্ষমতা ও অধিকার তার আছে। সে পর্দা করবে কি করবে না এ ব্যাপারে কেউ তাকে বাধ্য করতে পারবে না। কোনো মুসলিম পুজোয় অংশগ্রহণ করলে কেউ এটাকে খারাপ বলতে পারবে না, কেউ বাধাও দিতে পারবে না।

মোটকথা, ব্যক্তিকে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার ক্ষমতা দেওয়াই হলো স্বাধীনতা। কারণ তার আকল আছে। আর আকল থাকা অবস্থায় অন্য কেউ তার ভালো-মন্দ নির্ধারণ করে দিতে পারে না। আকলই তার জন্য যথেষ্ট। ফরাসি বিজ্ঞানী দেকার্ত দৃষ্টিভঙ্গিজনিত এই স্বাধীনতার প্রবর্তক। সাথে সাথে কান্টেরও ভালো অবদান আছে এর পক্ষে। দেকার্ত এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করে, যেখানে মানুষের আকলবহির্ভূত সবধরনের জ্ঞানই প্রত্যাখ্যান করা হয়। কারণ তার কাছে মানুষই জ্ঞানের উৎস। তার বিখ্যাত উক্তি হলো I think there for I am. আমি চিন্তা করি বলেই আমি 'আমি'।

মানুষ তার সত্তা ছাড়া যেকোনো বিষয়ে সন্দেহ করতে পারে। একমাত্র তার অস্তিত্বই নিশ্চিত। সুতরাং ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার ক্ষমতা মানুষের নিজ সত্তার। আর তা করবে আকল। কান্টের ভাষায়, আকলের এমন ক্ষমতা রয়েছে, সে পঞ্চেন্দ্রিয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য গুছিয়ে উপস্থাপন করতে পারে। আর প্রত্যেক মানুষই আকলসম্পন্ন। তাই সে নিজেই ভালো-মন্দ নির্ধারণ করতে পারবে। এটা জানার জন্য সে আল্লাহ ও নবী-রাসুলদের শিক্ষার মুখাপেক্ষী নয়। মোটকথা, তারা আল্লাহর স্থানে মানুষকে আর নবী-রাসুলদের শিক্ষার স্থানে আকলকে বসিয়েছে। এর ফলে যে মানব-

---

[৬৪] মাকালাতে তাফহিমে মাগরিব, ড. জাহিদ সিদ্দিক মোগল; ৮৪

সত্তা অস্তিত্বে আসে, তাকে খায়েশের গোলাম বলা যেতে পারে। অথচ সে খায়েশ পূরণ করার নেশায় নিজেকে সর্বস্বাধীন বলে দাবি করে।

স্বাধীনতা অর্জন করার বস্তুগত উপাদান হলো পুঁজি। যে যত বেশি পুঁজি অর্জন করতে পারবে সে ততই স্বাধীন। কারণ তার পুঁজি যত বৃদ্ধি পাবে সে তত বেশি খায়েশ পূরণ করতে পারবে। আর এই চিন্তা থেকেই সে নিজের সমস্ত যোগ্যতা ও ক্ষমতা পুঁজি অর্জন করার পেছনে ব্যয় করবে। বলা যায়, স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ ও বিকশিত রূপই হলো পুঁজিবাদ। স্বাধীনতার এই পাশ্চাত্য চেতনা ছাড়া পুঁজিবাদ অস্তিত্বে আসতে পারে না।

১.২ স্বাধীনতার ইসলামি দৃষ্টিকোণ

উপরের আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, পাশ্চাত্য সভ্যতায় স্বাধীনতাকে একটি উদ্দেশ্য এবং মাপকাঠি হিসেবে দেখা হয়। freedom as value. পাশ্চাত্য সভ্যতা রাষ্ট্রীয়ভাবে এই দাবি করে যে, রাষ্ট্র এমন পলিসি গ্রহণ করবে, যার মাধ্যমে ব্যক্তির যা ইচ্ছা তা করতে পারার ক্ষমতা তৈরি হবে।[৬৫] তার এই পথে কেউ বাধা হতে পারবে না (তবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব খর্ব করার অর্থে এর একটা সীমানা আছে...)।

পক্ষান্তরে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতা হলো আল্লাহকর্তৃক সংজ্ঞায়িত ভালো-মন্দের যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার যোগ্যতা। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করে তার হেদায়েতের ব্যবস্থা করেছেন; কিন্তু সৃষ্টিগতভাবে তাকে হেদায়েত গ্রহণে বাধ্য করেননি বরং তার মাঝে এই যোগ্যতা দিয়েছেন যে, সে হক গ্রহণ করে রবের নিষ্ঠাবান গোলাম হয়ে থাকবে অথবা হক অস্বীকার করে খোদাদ্রোহী হবে। অন্যভাবে বললে- ধর্মীয় গণ্ডিতে স্বাধীনতার অর্থ হলো ধর্মকর্তৃক নির্ধারিত ভালো-মন্দ দুইয়ের মধ্যে একটি গ্রহণ করার যোগ্যতা (ability to choose between good and bad)। ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার অধিকার মানুষের নেই, যাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা স্বাধীনতা বলে।

---

[৬৫] হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন, রাষ্ট্রের অস্তিত্বই ব্যক্তিকে সক্ষমতা দেবার জন্য, যাতে ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করতে পারে শান্তিতে। ব্যক্তিই সব। (The Human Person in Contemporary Philosophy, Frederick C. Copleston; PHILOSOPHY; Vol. 25, No. 92 (Jan., 1950), pp. 3-19)

ইসলামে স্বাধীনতার ধারণা এই নয় যে, ব্যক্তি যদি নিজ ইচ্ছায় কুফর গ্রহণ করে তা হলে তা-ই ভালো। বরং এটা মন্দ এবং এর জন্য অবশ্যই তাকে শাস্তি পেতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا

> হক তো তা-ই, যা আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে। যার ইচ্ছা সে তা গ্রহণ করবে আর যার ইচ্ছা অস্বীকার করবে। তবে আমি অস্বীকারকারীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি।[৬৬]

আয়াতের শুরুতেই সুস্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে, সত্য তা-ই, যা রবের পক্ষ থেকে আসে। সত্য মিথ্যা নির্ধারণ করার এখতিয়ার মানুষের নেই। তবে সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মিথ্যা গ্রহণ করার যোগ্যতা আছে। এটা স্বাধীনতা নয়, পরীক্ষা।

সুতরাং ইসলামে স্বাধীনতা একটি মাধ্যম মাত্র (freedom as resource)। অন্যান্য সৃষ্টিজীবের বিপরীতে মানুষের এই মাধ্যম ও যোগ্যতা রয়েছে যে, সে আল্লাহর নির্ধারণ-করা ভালো-মন্দ থেকে একটি গ্রহণ করতে পারবে। মূল উদ্দেশ্য স্বাধীনতাকে ব্যবহার করার অধিকার নয়; বরং তাকে রবের কাছে অর্পণ করে দেওয়া। আরো স্পষ্ট করে বললে ইসলামে আবদিয়্যাতই হলো মূল বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে মানুষের ভালো মন্দ গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকবে। কিন্তু ধর্ম কর্তৃক সংজ্ঞায়িত মন্দ গ্রহণ করার অধিকার থাকবে না। এজন্য মুসলমানদের পলিসি তা-ই হবে, যা আবদিয়্যাত তথা আল্লাহর আনুগত্যকে প্রতিষ্ঠা করে। পশ্চিমা অর্থে স্বাধীনতাকে দৃঢ় করে এমন কোনো পলিসি মুসলমান গ্রহণ করতে পারে না।

বুঝা গেল, পশ্চিমা স্বাধীনতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতপক্ষে আবদিয়্যাতকে প্রত্যাখ্যান করে। এটা অস্বীকার করে যে, মানুষ আল্লাহর বান্দা; তাই তার একমাত্র কাজ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। কারণ, স্বাধীনতার মূল কথা দাঁড়ায়, মানুষের প্রকৃত অধিকার, প্রভুত্বের দাবি (self- determination), যা মূলত হেদায়েত লাভের মাধ্যম খোদায়ি প্রত্যাদেশ মেনে নেওয়াকে

---

[৬৬] সুরা কাহাফ, আয়াত ২৯

অস্বীকার করে। সাথে এটা ইসলামের সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার ধারণাকেও প্রত্যাখ্যান করে। এই স্বাধীনতা মেনে নেওয়ার অর্থ হলো- ইসলামও সত্য। ইসলাম একমাত্র সত্য নয়। সত্যের কয়েকটি ধারণার মাঝে ইসলাম একটি। এর বাইরে আরো সত্য আছে। অথচ ইসলাম দাবি করে, সে একমাত্র হক। এর বাইরে যা কিছু আছে, সব বাতিল ও ভ্রান্ত।

১.৩ স্বাধীনতার ইসলামিকরণ

স্বাধীনতার ইসলামিকরণ দুইভাবে করা যায়।

এক. পশ্চিমা স্বাধীনতার সংজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রেখে।

দুই. পশ্চিমা স্বাধীনতার সংজ্ঞা পরিবর্তন করে।

প্রথম শ্রেণি পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত দিয়ে স্বাধীনতার পক্ষে দলিল পেশ করে। যেমন সুরা কাফিরুনসহ কুরআনুল কারিমের যেসব আয়াতে বলা হয়েছে- 'তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমাদের ধর্ম আমাদের', বা 'তোমাদের যা ইচ্ছা তা গ্রহণ কর'। অথবা 'যে চায় ঈমান আনুক, যে চায় কুফরি করুক'।

মূল বিষয় হলো বিভিন্ন দিক থেকে তারা এই আয়াতগুলোর মর্ম বুঝতে যেয়ে ভুলের শিকার হয়েছে। এই ব্যাপারে এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। তবে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটা পয়েন্ট তুলে ধরছি।

এক. মুফাসসিরগণের মতে আয়াতগুলো যেকোনো চিন্তা বা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করার অনুমোদনমূলক নয়; বরং ধমকিমূলক। যেমন অধীনস্থরা কথা না শুনলে আমরা রাগ করে বলি- 'তোমার যা ইচ্ছা করো।' এটা 'যা ইচ্ছা' তা করার অনুমোদন নয়; বরং নির্দেশিত কাজটি করার জন্য একটি রাগত উচ্চারণ। কুরআনুল কারিমের বর্ণনাগুলো এমন।

দুই. পশ্চিমা স্বাধীনতার দৃষ্টিতে ব্যক্তি যা করবে, তা-ই ভালো হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। সে নিজেই ভালো-মন্দের নীতিনির্ধারক। কিন্তু এ আয়াতগুলোতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করে দেওয়ার পর মানুষকে 'অপশন' প্রদান করা হয়েছে। সাথে সাথে আল্লাহর নির্ধারিত ভালো গ্রহণ এবং মন্দ বর্জন না করলে শাস্তির কথাও এসেছে।

সুতরাং বলা যায়, এই শ্রেণি না পাশ্চাত্য স্বাধীনতা বুঝেছে আর না পবিত্র কুরআনের আয়াতের মর্ম অনুধাবন করতে পেরেছে।

তিন. অধিকার কখনো মন্দ বিষয়ে হতে পারে না। ফলে ইসলামের নির্ধারিত ভালো-মন্দ থেকে কেউ যদি স্বাধীনতার ভিত্তিতে মন্দটা গ্রহণ করে তা হলে তা মন্দই থাকবে। আমরা তাকে খারাপ, জুলুম ও অনধিকার চর্চাই বলব। তাকে ভালো বলতে পারি না। তাকে অধিকার বলা মানে ইসলাম যে একমাত্র মানদণ্ড তা অস্বীকার করা এবং ইসলামকে কয়েকটি 'কল্যাণ-ধারণা'র একটি মনে করা, যেন ইসলাম একমাত্র কল্যাণকর দীন নয়, যেমনটি আল্লাহ্ বলেছেন।

আর দ্বিতীয় শ্রেণির দাবি হলো, ইসলামও স্বাধীনতাকে বাস্তবায়ন করে। তবে ইসলামের স্বাধীনতা হলো বান্দাকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলামিতে নিয়ে আসা। অর্থাৎ তারা দৃষ্টিভঙ্গিজনিত স্বাধীনতার ঐতিহাসিক সংজ্ঞা পরিবর্তন করে। কথাটি আপন জায়গায় ঠিক থাকলেও পশ্চিমাদের সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে দুই দিক থেকে এখানে ভ্রান্তি রয়েছে।

প্রথমত স্বাধীনতার একটি ঐতিহাসিক সংজ্ঞা রয়েছে, পারিভাষিক রূপ রয়েছে। তা হলো নফসের পূজা। পশ্চিমারা স্বাধীনতা দ্বারা এ কথাই উদ্দেশ্য নেয়। এখন তাদের সাথে হাত মিলিয়ে ইসলামিস্টদের স্বাধীনতার স্লোগান মানুষকে বিভ্রান্ত করে। পশ্চিমা মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করে। এজন্য যেকোনো বিতার্কিকের উচিত হবে 'ইসলাম মানুষকে স্বাধীনতা দেয়' এই বিতর্কে যাবার আগে পশ্চিমা স্বাধীনতার ঐতিহাসিক সংজ্ঞার সাথে ইসলামি স্বাধীনতার সংজ্ঞাগত পার্থক্য পরিষ্কার করা। তা হলে সেই ধারণা আর প্রতিষ্ঠিত হবে না, যা পশ্চিমারা কামনা করে।

দ্বিতীয়ত ইসলাম মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে বের করে স্বাধীনতা দিতে চায়- তা নয়! বরং ইসলামও মানুষকে গোলামিতে আবদ্ধ করতে চায়; তবে পার্থক্য—সেই গোলামি হলো রবের। আমাদের প্রকৃত মালিকের। ইসলাম অবশ্যই মানুষকে মানুষের দাসৎব থেকে মুক্ত করতে চায়; কিন্তু তারপর ইসলাম চায় মানুষ যেন আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করে নেয়। এই কথাটিই কাদেসিয়ায় রুস্তমের দরবারে খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল সাহাবি রিবই ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাষায়। তাকে

প্রশ্ন করা হয়েছিল, তোমরা এখানে কেন এসেছ? তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে এখানে আসার ব্যবস্থা করেছেন, যাতে আমরা তার ইচ্ছায় মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে বের করে আল্লাহর দাসত্বে, সংকীর্ণ পৃথিবীর মোহ থেকে প্রশস্ত জান্নাতের দিকে, খ্রিষ্টান ধর্মের অত্যাচার থেকে বের করে ন্যায় ও ইনসাফের ধর্ম ইসলামের দিকে নিয়ে যেতে পারি।[৬৭]

আমরা আল্লাহর গোলাম। এটাই আমাদের পরিচয়। আমরা পশ্চিমা অর্থে স্বাধীনতা চাই না। আমরা অন্যের দাসত্ব থেকে মুক্তি চাই। চাই নিজের দাসত্ব থেকেও মুক্তি। পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে লড়তে হলে আমাদের তাদের ভাষায় কথা বললে চলবে না। এতে তাদের সভ্যতারই উন্নতি হবে। আমাদের কথা বলতে হবে আমাদের ভাষায়। নিজস্ব শৈলীতে।

আমাদের বুঝতে হবে আদতে কোথাও স্বাধীনতা নেই। সবাই কারো না কারো গোলামি করছে। কেউ প্রবৃত্তির গোলামি করছে, কেউ করছে শরিয়তের। কেউ পাশ্চাত্যের গোলামি করছে, কেউ করছে ইসলামের। কেউ মানুষের গোলামি করছে, কেউ করছে আল্লাহর। বস্তুত গোলামি পাওয়ার একমাত্র যোগ্য ও উপযুক্ত সত্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। পৃথিবীতে তার গোলামি ছাড়া কারো গোলামি করার অনুমোদন নেই। কাফেরদের সাথে আমাদের লড়াইয়ের উদ্দেশ্য পৃথিবীতে আল্লাহর গোলামি প্রতিষ্ঠা করা। আমরা গোলামির জন্য নিজেদের উৎসর্গ করি; স্বাধীনতার জন্য নয়।

২.১ সমতা

পাশ্চাত্য স্বাধীনতা যখন এটা মেনে নিয়েছে যে মানুষের ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার অধিকার তার নিজের তখন প্রত্যেকের জন্য জরুরি হলো, সে অন্যের ব্যাপারেও এই সম-অধিকার মেনে নেবে। তাকে মানতে হবে, আমি যেমন নিজেরটা ঠিক করি, আরেকজনও তারটা ঠিক করবে। তার মাপকাঠিও ঠিক, আমারটাও ঠিক। ভালো-মন্দের সমস্ত মাপকাঠি সমান। কোনো মাপকাঠিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। সবার

---

[৬৭] তারিখু তাবারি- ৩/৫২০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া- ৯/৬২২।

নির্ধারিত ভালো-মন্দকে সমপর্যায়ের জ্ঞান করতে হবে। এটাই পাশ্চাত্য সমতা।[৬৮] অন্যভাবে বললে, মানুষ নিজ মস্তিষ্ক দিয়ে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করবে। আর প্রতিটি মানুষেরই মস্তিষ্ক রয়েছে। সুতরাং মস্তিষ্কের বিচারে যেহেতু সবাই সমান; তাই বিশ্বাস ও অধিকারের প্রশ্নেও সবাই সমান হবে। নারী-পুরুষ, কাফের-মুসলিম, বাবা-ছেলে, মা-মেয়ে সবাই সমান। এই হিসেবে প্রতিটি ধর্মই সমান। কোনো ধর্মকে খারাপ বলা যাবে না, যদিও তা কুফর হয়। শিরক হয়। প্রত্যেক ধর্মকেই এক সমান মনে করতে হবে। কেউ তার ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার ক্ষমতা ব্যবহার করে কুফরকে বেছে নিলে তাকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। কোনো হারাম অবলম্বন করলেও তাকে মন্দ বলা যাবে না। সবার চয়েজকে সমান মর্যাদা দিতে হবে।

২.২ ইসলামের দৃষ্টিতে সমতা

ইসলামের দৃষ্টিতে সমতার এই ধারণা আল্লাহর নেজামে হেদায়েত প্রত্যাখ্যান করার নামান্তর। সমতা মানে এই দাবি করা যে 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষের ভালো-মন্দ চিহ্নিত করে দেওয়ার জন্য নবী-রাসুলদের মাধ্যমে কোনো সূত্র প্রতিষ্ঠা করেননি। এমনকি মানুষের কাছে এমন কোনো খোদায়ি প্রত্যাদেশ নেই, যা অকাট্য এবং যার ভিত্তিতে খায়েশ ও আমলের মাঝে প্রাধান্য দানের মাপকাঠি নির্ধারণ করা যেতে পারে।' নেজামে হেদায়েতের মর্ম হলো, সমস্ত মানুষের খায়েশ ও কর্ম সমমর্যাদার নয়; বরং যে ব্যক্তির কর্ম নবীদের শিক্ষা অনুযায়ী হবে সে অন্যান্যের উপর প্রাধান্য পাবে। এজন্য ইসলামি রাষ্ট্র স্বাধীনতা ও সমতাকে কোনো সামাজিক মাপকাঠি ও উদ্দেশ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। ইসলামি রাষ্ট্র ভালো-মন্দের ব্যাপারে নিরপেক্ষ হয়ে সমস্ত 'ভালোর ধারণা'কে সমানভাবে সংরক্ষণ করবে, সেই সুযোগ নেই। বরং ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর নাজিলকৃত একমাত্র কল্যাণের ধারণাকে অন্যান্য কল্যাণের ধারণার (সেগুলো মূলত অকল্যাণ) উপর বিজয়ী করা। সেগুলোর সাথে আপস করা এবং সম-অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া ইসলামি রাষ্ট্রের পলিসি নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,[৬৯] তিনি তার রাসুলকে

---

[৬৮] ইসলামি ব্যাংকারি আওর জমহুরিয়্যত- ১৮১

[৬৯] সুরা ফাতহ, আয়াত ২৮

হেদায়েত ও সত্য দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সেই দীনকে অন্যান্য ধর্মের উপর বিজয়ী করেন।[৭০]

ইসলামই একমাত্র ভালো। ইসলামের বাইরে অন্য কোনো ভালোর ধারণা নেই যে তাকে সমান ভাবতে হবে কিংবা তার সাথে সমতা রক্ষা করতে হবে। আর ইসলাম সমতাকে নয়; আদল (ন্যায়) প্রতিষ্ঠা করে। কারণ ইসলামই একমাত্র ন্যায়। এর বাইরে ন্যায়ের কোনো ধারণা নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেসব বিধান দিয়েছেন, সেগুলোই আদল। আদলের সংজ্ঞা, সীমা ও প্রকৃতি ইসলামই নির্ধারণ করবে। ইসলামের বাইরে এমন কোনো মানদণ্ড নেই, যার ভিত্তিতে আল্লাহর বিধানকে আদলের সার্টিফিকেট দিতে হবে। সুতরাং একজন কাফেরকে মন্ত্রী হওয়ার অধিকার না দেওয়াই আদল। কারণ কুফর সত্তাগতভাবেই অনিষ্টকর। আর যে তা ধারণ করে তার নেতৃত্ব কখনোই আদল হতে পারে না। এখানে সম-অধিকারের প্রশ্ন তোলা যাবে না। সামগ্রিকভাবে ইসলাম আদলকে রক্ষা করে; পশ্চিমা অর্থে সমতাকে নয়।

অন্যভাবে বললে, ইসলাম অবস্থানুসারে প্রত্যেকের পর্যায় রক্ষা করার কথা বলে; সমতার নয়। ইসলামে ব্যক্তির মর্যাদার মাপকাঠি তাকওয়া বা খোদাভীতি। ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য লিবারেল রাষ্ট্রের মতো প্রত্যেক সদস্যের জন্য নিজ নিজ খায়েশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার অধিকার ও পরিবেশ নিশ্চিত করা নয়। বরং তাদের খায়েশকে নেজামে হেদায়েতের (ওহির) অনুগামী করার পরিবেশ তৈরি করা। এজন্য ইসলামি রাষ্ট্রনীতিতে citizen (এমন সাধারণ জনতা, যারা মূলত শাসক ও সিদ্ধান্ত প্রদানকারী হয়ে থাকে) এবং representation of citizens (জনপ্রতিনিধি) এর কোনো ধারণা নেই। কারণ ইসলামে সাধারণ জনতা citizen নয়; বরং প্রজা হয়ে থাকে। আর খলিফা এমন কোনো জনপ্রতিনিধি নয়, যার দায়িত্ব হবে সাধারণ লোকদের খায়েশ মোতাবেক সিদ্ধান্ত দেওয়া। বরং সে আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতিনিধি। তার লক্ষ্য প্রজাদের খায়েশকে শরিয়তের অনুগামী করার জন্য ইসলামি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। পক্ষান্তরে স্বাধীনতা এবং সমতার অর্থ হলো আল্লাহকর্তৃক

---

[৭০] ইসলামি ব্যাংকারি আওর জমহুরিয়্যত- ১৮৩

নির্ধারিত অধিকার ও আদলের বিপরীতে মানুষ নিজেই ভালো-মন্দ নির্ধারণ করবে। প্রত্যেকের নির্ধারিত ভালোর ধারণা ও জীবনাচার সমাজে সমান অবস্থান রাখে। আর তখন রাষ্ট্রের কাজ হবে এমন সমাজ-ব্যবস্থা তৈরি করা, যেখানে প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ খায়েশ পূরণ করবে এবং তা অর্জন করার জন্য তারা সক্ষম হয়ে উঠবে।[৭১]

২.৩ সমতার ইসলামিকরণ

কোনো কোনো মুসলিম ইসলামের মাধ্যমে সমতার সেই অর্থ প্রমাণ করতে চায়, যা পাশ্চাত্য সভ্যতার আকিদার অংশ। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে কোনোভাবে নারী-পুরুষ, মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কিছু সমতার দৃষ্টান্ত দেখাতে। এই ধরনের খণ্ডবিখণ্ড দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তারা মানুষকে এ কথা বুঝাতে চায় যে, ইসলামও সামগ্রিকভাবে সমতার শিক্ষা দেয়। মূলত কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদল[৭২] সমতার রূপে প্রকাশ পায়। তার মানে এই নয় যে ইসলাম সামগ্রিকভাবে সমতাকে গ্রহণ করে এবং এটাকে মূলনীতি কিংবা মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করে। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমতা জুলুম হয়ে যায়। তাদের মানসিক দৈন্যের অবস্থা এমন যে তারা পাশ্চাত্য সমতাকে এক অকাট্য এবং প্রশ্নাতীত মানদণ্ড হিসেবে মেনে নিয়েছে, যেন ইসলামকেই পাশ্চাত্য মানদণ্ডে বিচার করে দেখা লাগবে। মূলত এদেরকে মডার্নিস্ট বলা হয়। মডার্নিস্টরা পাশ্চাত্য স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতির আলোকে ইসলামকে পর্যালোচনা করে। ইসলামের কোনো বিষয় যদি এগুলোর সাথে মিলে যায় তা হলে তা গ্রহণ করবে। আর না মিললে পাশ্চাত্যের সাথে খাপ খাইয়ে তার ভিন্ন ব্যাখ্যা হাজির করবে। এভাবেই তারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চায়, যা প্রকারান্তরে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

---

[৭১] হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন, রাষ্ট্রের অস্তিত্বই ব্যক্তিকে সক্ষমতা দেবার জন্য, যাতে ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করতে পারে শান্তিতে। ব্যক্তিই সব। (The Human Person in Contemporary Philosophy, Frederick C. Copleston; PHILOSOPHY; Vol. 25, No. 92 (Jan., 1950), pp. 3-19)

[৭২] ইসলাম সংজ্ঞায়িত ইনসাফ, যা সমতা নয় বরং প্রত্যেকের অবস্থা ও দায়িত্বের পরিধি বিচার করে সিদ্ধান্ত দেওয়া।

যেসব আয়াত ও হাদিসে বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমতার দৃষ্টান্ত এসেছে, মডার্নিস্টরা সেগুলো ব্যবহার করে পাশ্চাত্য সমতাকে ইসলামি করার প্রয়াস চালায়। মনে রাখতে হবে বিধান প্রয়োগ আর অধিকার এক নয়। বিধান প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হলো, একজন সাধারণ লোক চুরি করলে তার উপর যেমন হাত কাটার হদ প্রয়োগ হবে তেমন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এই বিধান সমানভাবে প্রয়োগ করা হবে।[৭৩] কিন্তু অধিকারের প্রশ্নে সবাই কখনো সমান পাবে না। যে যার যোগ্য ও হকদার তা পাওয়াই হলো ইনসাফ বা ন্যায়। ইসলাম ন্যায়ের কথা বলে। সমতার মাঝেই ন্যায় নিহিত নয়। সমতা অনেক সময় জুলুম হয়। কখনো কখনো ন্যায় হয়।

একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা সহজ হবে। ধরা যাক এক ব্যক্তি দুই ছেলে এবং চার লক্ষ টাকা রেখে মারা গেল। তার উভয় সন্তানই ২ লাখ করে পেল। এই ক্ষেত্রে ন্যায় ও সমতা একসাথে পাওয়া গেল। আরেক ব্যক্তি দুই ছেলে ও এক মেয়ে এবং ৫ লাখ টাকা রেখে মারা গেল। তার দুই ছেলে দুই লাখ করে চার লাখ আর মেয়ে এক লাখ পেল। এ ক্ষেত্রে সমতা নেই; তবে ন্যায্যতা পাওয়া গেছে। আরেকজন তিন ছেলে ও দুই মেয়ে এবং ১০ লাখ টাকা রেখে গেল। আর প্রত্যেকেই ২ লাখ করে টাকা গ্রহণ করল। এই ক্ষেত্রে সমতা পাওয়া গেলেও ইনসাফ পাওয়া যায়নি। এই সমতা জুলুম। এজন্য ইসলাম ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমা সমতার কথা বলে না। বরং ইসলাম আদলের কথা বলে, যা প্রত্যেককেই দেয় তার নির্ধারিত প্রাপ্য।

৩.১ উন্নতি (Development)

স্বাধীনতা ও সমতার পর পাশ্চাত্য সভ্যতার তৃতীয় মূলনীতি বা আকিদা হলো উন্নতি। সমস্ত কাজ পাশ্চাত্য সভ্যতা এই তিন আকিদার আলোকে মূল্যায়ন করে। এর মধ্য থেকে যেকোনো একটি আকিদা ক্ষুণ্ণ হলে তারা তা সহ্য করে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, উল্লিখিত তিনটি বিষয়ই পরস্পর ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। বিশেষত স্বাধীনতা এবং উন্নতির সম্পর্কটা আরো গভীর। মূলত স্বাধীনতার বস্তুগত রূপ হলো উন্নতি। এখানে উন্নতি বলতে

---

[৭৩] জাওয়াহিরুল ফিকহ- ২/৭৮

পুঁজির ধারাবাহিক ও সীমাহীন বৃদ্ধিকে বুঝানো হচ্ছে। নৈতিক মূল্যবোধের এখানে কোনো মূল্য নেই। মানুষ তার খোদায়ি আসনে থেকে সমস্ত খায়েশ পূরণ করার যোগ্যতা একমাত্র পুঁজির মাধ্যমেই অর্জন করতে পারে। তাই পুঁজির বৃদ্ধিই উন্নতি। উন্নতি মানে অঢেল অর্থ। বলা যায়, উন্নতির এই ধারণা পাশ্চাত্য সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্থনৈতিক দিক হলো এই উন্নতি, যাকে পুঁজিবাদ বলা যেতে পারে। সম্পদের অসীম ও ক্রমাগত বৃদ্ধিই যখন সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন সম্পদ পরিণত হয় পুঁজিতে। এই অর্থে পুঁজিবাদ হলো হিংসা ও অর্থলিপ্সার বাস্তব রূপ। আর একজন পুঁজিবাদী হলো সেই লোভ ও হিংসার গোলাম। দিনার-দিরহামের পূজারি। একজন পুঁজিবাদী বিশ্বাস করে সম্পদের একমাত্র সঠিক ব্যবহার হলো ক্রমাগত পুঁজিবৃদ্ধি। তার কাছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মূল লক্ষ ইন্দ্রিয়কে সন্তুষ্ট করা এবং স্বাধীনভাবে এটাকে বৃদ্ধি করা। আর এই বৃদ্ধি পুঁজির মাধ্যমেই সম্ভব। কেননা পুঁজি ছাড়া কামনা-বাসনার পেছনে অন্ধভাবে ছুটে চলা যায় না।[৭৪]

এজন্য যার কাছে যত সম্পদ সে তত স্বাধীন। পাশ্চাত্য দর্শনে এটা স্বীকৃত যে, মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ তখনই হবে যখন সে স্বাধীন থাকবে।[৭৫] আর স্বাধীনতার বিকাশ নির্ভর করে পুঁজির উপর। ফলে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্রমাগত পুঁজিবৃদ্ধি। ফলে একজন অর্থনীতিবিদকে যেভাবে মূল্যায়ন করা হয় পুঁজিবাদী সমাজে, কোনো ধর্মীয় পদাধিকারী ব্যক্তি সেভাবে মূল্যায়িত হন না। কারণ একজন অর্থনীতিবিদ তো স্বাধীনতার বস্তুগত আকৃতি তথা উন্নতির বাহন পুঁজিবৃদ্ধির পথ দেখাবে। পক্ষান্তরে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষটি এমন কোনো বিষয়ের দাওয়াত দেয় না, যার সাথে পশ্চিমা অর্থে উন্নতির বিশেষ কোনো সম্পর্ক আছে। বরং সে দুনিয়াবিমুখতার দাওয়াত দেয়। আল্লাহর রাহে সম্পদ ব্যয়ের আহ্বান

---

[৭৪] ড. জাবেদ আকবর আনসারি; ইসলামী ব্যাংক : ভুল প্রশ্নের ভুল উত্তর- ২০ থেকে উদ্ধৃত।

[৭৫] 'ব্যক্তি'র (human person) প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো স্বাধীনতা। প্রাণিসত্তাকে অতিক্রম করে ব্যক্তিসত্তায় যাবার রাস্তা হলো 'পরিপূর্ণ স্বাধীনতা' (Jean-Paul Sartre, L'Être et le Néant.)

জানায়। ফলে পুঁজিবাদী কাঠামোতে তার তেমন মূল্যায়ন হয় না। কিন্তু শরয়ি কাঠামোতে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী সেই হবে, যে তাকওয়ার অধিকারী হবে, যদিও সে পুঁজিহীন হয়।

উন্নতির পাশ্চাত্য ধারণার প্রথম কথা হলো, পুঁজির ধারাবাহিক এবং সীমাহীন বৃদ্ধি। আর এর চূড়ান্ত চিত্র হলো স্বাধীনতা ও সমতার পরিবেশ তৈরি হওয়া। স্বাধীনতা, সমতা ও পুঁজিবৃদ্ধির পরিধি যত বিস্তৃত হবে, পাশ্চাত্যের ধারণায় সেখানে তত উন্নতি হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। অবাধ যৌনতা, নারী-পুরুষের উন্মুক্ত মেলামেশা বৃদ্ধি পাওয়া এবং ধর্মীয় অনুশাসন ও বাধ্যবাধকতা হ্রাস পাওয়া পাশ্চাত্যের কাছে উন্নতি। বর্তমান পাশ্চাত্যের উন্নতির মানদণ্ড দুটি। জিডিপি বৃদ্ধি পাওয়া এবং স্বাধীনতা ও সমতার পরিবেশ তৈরি হওয়া। উন্নতির এই মাপকাঠিতে দীনি পরিবেশ বৃদ্ধি পাওয়াকে অবনতি ও পশ্চাদগামিতা হিসেবে দেখানো হয়। যে এলাকায় শরয়ি বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়, পাশ্চাত্য উন্নতির মাপকাঠিতে সেই এলাকা বর্বর, অসভ্য ও অনুন্নত। পাশ্চাত্যের এই মাপকাঠিতে জায়গা নেই ধর্ম, নৈতিকতা, সামাজিক সম্পর্কসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের।

৩.২ ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নতি

পাশ্চাত্য উন্নতির মূলকথা হলো, নফসকে খুশি করার যোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়া। সীমাহীন খায়েশ ও চাহিদা পূরণ করতে পারা। কিন্তু ইসলাম কামনা-বাসনা ও চাহিদা সীমাহীন হওয়ার স্বীকৃতি দেয় না। ইসলাম বরং দুনিয়াবিমুখতা ও অল্পতুষ্টির চেতনা ধারণ করে। সীমাহীন কামনা-বাসনা পূরণ ও অবাধ মুনাফা অর্জনের ভিত্তিতে ইসলামে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় না। ইসলামে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতের সফলতাই একমাত্র লক্ষ্য। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার কাজ পাশ্চাত্য উন্নতি এবং তার জন্য উপযুক্ত পলিসি তৈরি করা নয়। বরং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো, এমন ব্যবস্থাপনা তৈরি করা, যেখানে দীনি সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, আখেরাতের সফলতা অর্জন করা সহজ হবে, মানুষ যুহদ ও অল্পতুষ্টির গুণ অর্জন করবে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটাই উন্নতি। যেখানে মানুষের পুঁজি বৃদ্ধি পাচ্ছে; কিন্তু ইসলামি পরিবেশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে, তাকে ইসলাম উন্নতি বলে না। ইসলামের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে তা অবনতি।

ইসলামের দৃষ্টিতে যা উন্নতি, পাশ্চাত্যের কাছে তাই পশ্চাদগামিতা। অথচ বাস্তবতা হলো, ইসলাম যাকে পশ্চাদগামিতা বলছে পশ্চিমরা তাকেই গ্রহণ করছে আধুনিকতা ও প্রগতি হিসেবে। মহান আল্লাহ বলেন,

نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ

> রাসুল হলেন মানবজাতির জন্য একজন সতর্কবার্তা প্রদানকারী। তোমাদের যার ইচ্ছা (তার অনুসরণ করে) উন্নতি করবে। আর যার ইচ্ছা (তার বিরোধিতা করে) পশ্চাদমুখী হবে।[৭৬]

হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'হে জনপদবাসী, তোমরা সরল সঠিক পথে (ইসলামের উপর) অবিচল থাকো। এটাই তোমাদের জন্য অগ্রগতি। যদি এই পথ ছেড়ে ডান বা বামের কোনো পথ (সভ্যতা, আদর্শ, মতবাদ) অবলম্বন করো, তা হলে তোমরা পথভ্রষ্ট এবং পশ্চাদমুখী হয়ে পড়বে।'[৭৭]

সুতরাং বুঝা গেল, ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নতির মূলকথা হলো দীনি পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া, আল্লাহর দীন মানা সহজতর হওয়া এবং শরিয়াহর প্রতিটি আইন প্রতিষ্ঠিত থাকা। পাশ্চাত্যের জিডিপি আর বস্তুগত উন্নয়ন ইসলামের দৃষ্টিতে আসল উন্নতি নয়। আধুনিক মুসলিমদের একটি বড় সমস্যা হলো, তারা বর্তমান পাশ্চাত্য বিশ্বে উন্নতির স্বরূপ খুঁজতে যায়। কিন্তু তারা ভুলে যায়, মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে উন্নত যুগ ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ, সাহাবায়ে কেরামের যুগ এবং সালাফদের যুগ। তৎপরবর্তী প্রতিটি যুগই মুসলিমদের অবনতি নিয়ে হাজির হয়েছে। আধুনিক মুসলিমদের আপত্তি হলো, মোল্লারা আমাদের ১৪০০ বছর পেছনে নিয়ে যেতে চায়। নিঃসন্দেহে হুজুররা চায়, দুনিয়া আবার সেই জায়গায় ফিরে যাক, যেখানে রাসুলের যুগে ছিল, সাহাবিদের যুগে ছিল, সালাফদের যুগে ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে সেগুলোই ছিল সবচেয়ে উন্নত যুগ। উম্মতের প্রথম সারির মনীষীদের জীবনধারাই পরবর্তী লোকেদের উন্নতির সোপান।

---

[৭৬] সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত ৩৬, ৩৭

[৭৭] বুখারি- ৭২৮

পাশ্চাত্য দুনিয়া আমাদের প্রশ্ন করে পুরো ইসলামি ইতিহাসে তোমরা নিউটনের মতো একজন বিজ্ঞানী দেখাও তো পারলে! এর উত্তরে পালটা আমরা ফারাবি, ইবনে হাইসাম, ইবনে হাইয়ানদের দেখাতে যাব না। বরং আমরা সুফিয়ান সাওরি, আবদুল কাদের জিলানির মতো মনীষীদের দেখাব। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ি, তাবেতাবেয়ি, আয়িম্মায়ে কেরামসহ আকাবির-আসলাফের পবিত্র জামাতের কাউকে উপস্থাপন করে বলব তোমরা পারলে পাশ্চাত্যের ইতিহাসে এমন কাউকে দেখাও! ইবনে হাইসাম আর ফারাবি নিঃসন্দেহে আমাদের লোক। তবে বুঝতে হবে, তারা যে কারণে প্রসিদ্ধ- সেই অঙ্গনটা আমাদের উন্নতির মাপকাঠি নয়। আমরা অন্য আলোচনায় তাদের প্রসঙ্গ টানতে পারি। তবে এই প্রশ্নের উত্তরে নয়। কারণ এই প্রশ্ন শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠির, এই প্রশ্ন আত্মোন্নয়নের সিঁড়ির, এই প্রশ্ন সভ্যতার মানদণ্ডের।

পাশ্চাত্য এই প্রশ্ন এজন্যই করে যে, তাদের কাছে বস্তুগত উন্নতিই সবকিছু। কিন্তু আমাদের উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্র ভিন্ন। পাশ্চাত্য আর ইসলামের কাজের জায়গা আলাদা। এজন্য তাদের এরকম প্রশ্নে ফারাবি আর ইবনে হাইসামদের দেখানোর অর্থ হলো, নিজেদের উন্নতির সর্বোচ্চ মাকাম নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগা। নিজেদের আত্মোন্নতির সিঁড়িকে তুচ্ছ ভাবা। সর্বোপরি আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভোগা। আমাদের কাছে চির উন্নত ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরামসহ সালাফ ও পূর্বসূরিদের পবিত্র জামাত। আমাদের সভ্যতার প্রথম কথা হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়া এবং তাকওয়া অর্জন করা।

এমন পরাজিত মানসিকতার কারণেই আমাদের শিশু, তরুণ ও যুবকরা সাহাবায়ে কেরামের মতো হতে চায় না। সালাফ ও পূর্বসূরিদের জীবনবৃত্তান্ত দেখে অনুপ্রাণিত হয় না। তাদের নিয়ে গর্ব করতে পারে না। কারণ তাদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম- পার্থিব উন্নতি এবং এইজাতীয় প্রতিভার কিছু চরিত্র বসবাস করে। আমাদের এমন পরাজিত মানসিকতা নতুন প্রজন্মকে তাদের কেবলা ভুলিয়ে দিচ্ছে। পাশ্চাত্য চরিত্র তাদের রঙিন স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। মুসলিমদের ভেতর থেকেই তৈরি হচ্ছে এক আত্মপরিচয়হীন জাতি!

পাশ্চাত্যের কিছু মতবাদ

আধুনিক কালের সব সমস্যার মূলেই আমাদের আলোচিত এই তিন আকিদা। এর উপর ভিত্তি করেই জন্ম নিয়েছে সব পাশ্চাত্য আন্দোলন। উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকটি আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে- ফেমিনিজম আন্দোলন, ইন্টারফেইথ, মুক্তচিন্তা ইত্যাদি। এসব আন্দোলনের সাথে স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতির পাশ্চাত্য ধারণার সরাসরি মৌলিক সম্পর্ক রয়েছে। এখানে সবক'টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার কোনো সুযোগ নেই। তা ছাড়া প্রায় সব বিষয় নিয়েই পৃথক কাজ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আমি কেবল এখানে প্রতিটি বিষয়ের সাথে পাশ্চাত্য আকিদার যোগসূত্রটা তুলে ধরার চেষ্টা করব, যেন সমস্যার মূল জায়গাটা আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

ফেমিনিজম বা নারীবাদ

স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতির পাশ্চাত্য ধারণার সাথে নারীবাদী আন্দোলনের সম্পর্কটা সুস্পষ্ট। ফেমিনিস্টদের দাবির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায়। তাদের প্রতিটি দাবির পেছনেই এই বিশ্বাসগুলো কাজ করে। নারীবাদ সৃষ্টির পেছনে ইউরোপের বর্বরতার ইতিহাস থাকলেও পাশ্চাত্য বিশ্বাসই এটাকে স্বতন্ত্র মতবাদ কিংবা ইজমে রূপান্তরিত করেছে। ইউরোপের খ্রিষ্টানসমাজে নারী নির্যাতনের ইতিহাস অনেক পুরোনো। খ্রিষ্টানসমাজের নারীরা এই নিপীড়নমূলক অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিজেদের বিকৃত ধর্মে এর সমাধান খোঁজে। সেখানে কোনো সমাধানের অস্তিত্ব তারা পায়নি। নিজেদের মূল্যায়ন ও উল্লেখযোগ্য কোনো অধিকারেরও সন্ধান পায়নি তারা খ্রিষ্টধর্মে। তখন তারা মুক্তির জন্য পাশ্চাত্যের ঘোষিত মূলনীতি বেছে নেয়। গ্রহণ করে পাশ্চাত্যের স্বাধীনতা, সমতা আর উন্নতির বস্তাপচা ধারণা। পুরো নারীবাদকে আমরা ৩টি দাবি কিংবা স্লোগানের ভেতর দিয়ে দেখতে পারি।

এক

নারী তোমার উপর থাকতে পারবে না কারো কর্তৃত্ব, তুমি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তোমার কারো প্রয়োজন নেই। স্বামী, সন্তান, পরিবার সবই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বিষয়।

নারীবাদীদের এমন স্লোগানের মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য স্বাধীনতার দর্শন। কি ধর্ম, কি পরিবার আর কি সমাজ, কারো বেঁধে দেওয়া ভালো-মন্দে নারী বিশ্বাসী হতে পারে না। সে যা ভালো মনে করবে, তা-ই করবে। নারী যখন এই পাশ্চাত্য স্বাধীনতাকে গ্রহণ করতে চাইবে তখন ঘরে অবস্থান, পরিবার পরিচালনা, পুরুষের অভিভাবকত্ব গ্রহণের মতো আল্লাহপ্রদত্ত বিষয়গুলো পরাধীনতা কিংবা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বোঝাই মনে হবে। পর্দার বিধানকে সে শেকল আর বস্তাবন্দি বলে আখ্যায়িত করবে। আর এভাবেই সে আল্লাহপ্রদত্ত কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে পাশ্চাত্যের দাসত্বে প্রবেশ করে আর নিজেকে স্বাধীন ভাবতে শুরু করে। নারীবাদীরা তাদের নিজস্ব প্রকৃতি ছেড়ে পুরুষের প্রকৃতি গ্রহণ করতে চায়। নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্জন করে পুরুষের অনুকরণ করতে চায়। এখানে কোনো স্বকীয়তা নেই, নেই কোনো অনন্যতা। একজন নারীবাদী নারী তার স্বামীকে খদ্দেরের চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে পারে না, যেখানে কারেন্সি বা বিনিময়ই মুখ্য। প্রেম, ভালোবাসা, মমতা ও দায়িত্ববোধের সেখানে কোনো বালাই নেই।

তাদের সকল সমস্যা নারীর আল্লাহপ্রদত্ত মাতৃত্ববোধের সাথে। পরিবারকে খুশি রাখা, সংসারের প্রতি মনোযোগী হওয়া, সন্তান প্রতিপালন করার ব্যাপারে সিরিয়াস থাকাই তাদের কাছে পরাধীনতা; অথচ এগুলো নারীর সহজাত ভূমিকা। তাদের কাছে একজন নারীর স্বাধীনতা হলো নগদ বিনিময় প্রাপ্তি, এমনকি যদি তা হয় দেহসর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেও। নারীবাদ হলো চরম ভোগবাদী চিন্তাভাবনা। মেকআপ, ড্রেসিং, ইনকাম, দেহ আর বিচরণ স্বাধীনতার মাঝেই আটকে আছে তাদের পরিচয়। তারা মনে করে এগুলো করতে পারাই একজন নারীর সফলতা!

দুই

নারী! একজন পুরুষ কখনোই তোমার আস্থার জায়গা হতে পারে না। এজন্য তুমি তার উপর নির্ভর না করে বরং তার প্রতিদ্বন্দ্বী হও। প্রতিটি

ক্ষেত্রেই তার সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও। তাল মিলিয়ে চলো। এগিয়ে যাও তাকে পেছনে ফেলে।

এই স্লোগানটি দেখবেন পাশ্চাত্য সমতার সাথে সম্পৃক্ত। ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার যখন সবার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা রয়েছে, তখন একজন নারী কেন তার স্বাধীনতা (নিজের ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার ক্ষমতা) ভোগ করবে না। কেন এখানে নারী-পুরুষের ব্যবধান সৃষ্টি করা হবে? পুরুষ কেন উত্তরাধিকার সম্পত্তি নারীর চেয়ে বেশি পাবে? পুরুষ বাইরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারলে নারী কেন পারবে না?

পাশ্চাত্য সমতাকে স্ট্যান্ডার্ড মেনে নিলে এরকম নানান জায়গায় প্রশ্ন আসবে, যেখানে নারী-পুরুষের বিধান ও অধিকারের মাঝে ব্যবধান রয়েছে। কারণ ইসলাম সমতাকে মানদণ্ড মানে না। ইসলাম সর্বদা ন্যায় ও ইনসাফের পক্ষে থাকে; সমতার সাথে নয়। কারণ প্রচলিত সমান অধিকারের ধারণা সব জায়গায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। ক্ষেত্রবিশেষে তা এক পক্ষের উপর জুলুম বয়ে আনে। যার যা প্রয়োজন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ তাকে তা প্রদান করাই হলো ন্যায়। পুরুষকে স্ত্রী, মা, বাবাসহ পরিবারের সবার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলামে নারীকে কারো ব্যয় বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এই দায়িত্ব আল্লাহকর্তৃক নির্ধারিত। কাজেই নারী যা পাবে, সবটাই তার সেভিং। সেখানে কারো প্রাপ্য অংশ নেই। ফলে পুরুষের টাকার প্রয়োজন বেশি এবং উপার্জন ও খাদ্যযোগানের জন্য তাকে আবশ্যিকভাবে নিয়মিত বাইরে যেতে হয়। এজন্য তাকে বেশি ভাগ দেওয়া হয়েছে এবং তাকে বাহির সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাহির সামলানোর দায়িত্ব নারীর নয়। তার দায়িত্বের জায়গা পরিবার। ফলে তাকে ঘরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বামীর ভরণ-পোষণই তার জন্য যথেষ্ট। আর বাবার সম্পত্তি তার জন্য অতিরিক্ত। সম্পত্তির ভাগে তাকে কম দেওয়াটা অন্যায় নয়; বরং ন্যায়সঙ্গত। স্বামী যদি তার দায়িত্ব পালন না করে তা হলে স্ত্রীর অধিকার আছে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার। নারী পুরুষ কেউই সমান নয়। বরং একজন আরেকজনের জন্য পরিপূরক।

আধুনিক সময়ে এসে নারী পুরুষের এই সমতার প্রশ্ন শুধু বিধান এবং অধিকারেই সীমাবদ্ধ নেই। এখন সৃষ্টিগত এবং জিনগতভাবেই নারী-

পুরুষের সমতার দাবি তোলা হচ্ছে। নারীবাদ ও তার পৃষ্ঠপোষকদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, নারী-পুরুষের পার্থক্য নিছক একটি সামাজিক নির্মাণ বা সোসাল কন্সট্রাক্ট (জেন্ডার ধারণা)। আদতে এখানে বায়োলজিক্যাল কোনো ব্যবধান নেই। সমাজে প্রচলিত বৈষম্যের ফলেই একজন মেয়ে কোমল, ঘরের কোণে থাকতে পছন্দ-করা, মাতৃত্ব ইত্যাদি গুণসম্পন্ন মানবীতে পরিণত হয়। নতুবা সেও ছেলেদের মতো বহির্মুখী ও পুরুষালি গুণাবলির অধিকারী হতো। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই মিথের পক্ষে পশ্চিমা রিসার্চ পেপারও পাওয়া যায়। বড় অদ্ভুত তাদের গবেষণা! বড় অদ্ভুত তাদের সমাজবিজ্ঞান! আদতে বর্তমান বিজ্ঞান আর গবেষণা-প্রতিষ্ঠানগুলো চলে ক্ষমতা আর মিথ্যাচারের উপর।[৭৮] পৃথিবীর সমস্ত কর্মকাণ্ড একসেট মিথ্যাচারের উপর ভিত্তি করে মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য পরিচালিত হচ্ছে। মিডিয়া, বিজ্ঞান, অর্থনীতি সবকিছু পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা রক্ষার জন্য পাশ্চাত্য পক্ষপাতদুষ্ট গবেষণা ও ফল প্রকাশ করে। এটা তারা করে আসছে যুগ যুগ ধরে। নতুবা ডোনেশনের

---

[৭৮] নারীপুরুষ সমতা প্রমাণের বৈজ্ঞানিক ধাপ্পাবাজির একটা ছোট্ট নমুনা উল্লেখ করছি: ইদানীং আমরা যে IQ টেস্ট করি, সেই পদ্ধতিটি ১৯৫০ এর দশকে Dr. D Wechsler এর বানানো। শুরুতে তিনি পেলেন ৩০-এরও বেশি টেস্ট নারী-পুরুষের মাঝে 'একজনের' পক্ষে 'বৈষম্য' করছে। যেন টেস্টেরই দোষ, সে কেন একই রেজাল্ট দিচ্ছে না। কেন দুই লিঙ্গ দুই রকম পারফর্ম করবে? উভয়ে তো সমান। অতএব, টেস্টই ঠিক নেই। বোঝেন ব্যাপারটা।

পারফর্মেন্স গ্যাপ যেগুলোতে বেশি, সেই টেস্টগুলো বাদ দিয়ে দিলেন মিস্টার Wechsler. 'সমস্যা'টা সমাধান করা দরকার। এরপরও যখন দুই লিঙ্গকে সমান দেখানো যাচ্ছে না, তখন যা করা হলো: কিছু টেস্ট রাখা হলো যেগুলোতে পুরুষ ভালো করে, নারী খারাপ করে। আর কিছু টেস্ট রাখা হলো, যেগুলোতে নারীরা ভালো করে, পুরুষ খারাপ করে। পুরোটাকে বলা হলো 'IQ টেস্ট'; এবং 'নারী-পুরুষ' আইকিউ সমান।

এই হলো বিজ্ঞানের অবস্থা। যখন গবেষণার রেজাল্ট আপনার পছন্দ হচ্ছে না, মনমতো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আপনি প্রাপ্ত ডেটা এদিক-সেদিক করে নিচ্ছেন। উদাহরণত, অলিম্পিকে কোনো পোলভোল্ট ইভেন্টে কয়েকজন অ্যাথলেটকে আপনি ওজনের বাটখারা বেঁধে দিচ্ছেন আর কয়েকজনকে পোলের উচ্চতা কমিয়ে দিচ্ছেন। যাতে 'সত্য'টা প্রমাণিত হয় যে, শক্তি আর দ্রুততা যাই হোক, সৃষ্টিগতভাবে সব পোলভল্টারই সমান। (all the pole-vaulters, regardless of their prowess and agility, are created equal) Brainsex, page 13. Anne Moir Phd. এবং David Jessel.

অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে বেশ্যাবৃত্তির মতো এই অদ্ভুত বিজ্ঞানচর্চা।[৭৯] এজন্যই বলি, বিজ্ঞান দিয়ে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করার আগে বিজ্ঞানের সত্যতা নিশ্চিত করে নেওয়া দরকার। বিজ্ঞান অকাট্য কোনো বিষয় নয় যে, তার সবকিছু চিরসত্য হবে। কিন্তু ইসলাম চিরসত্য এবং অকাট্য।

তিন

নারী! তোমার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতাই তোমার সম্মানের একমাত্র উপায়। অন্যের আয়ের উপর নির্ভরশীল হলে মানে তুমি নিজের সম্মান হারালে। এজন্য তোমাকে নিজস্ব অর্থনৈতিক আয়ে স্বাবলম্বী হতে হবে।

নারীবাদীদের এই স্লোগানটির সম্পর্ক পাশ্চাত্য আকিদার তৃতীয় বিষয় তথা উন্নতির সাথে, যেখানে উন্নয়নকে মাপা হয় কেবল জিডিপি আর জিএনপির স্কেলে। ফলে পরিবারের আঙিনায় নারীর ভূমিকার মূল্যায়ন করা হয় না পাশ্চাত্য সমাজে। নারীকে ঘর থেকে বের করে কর্মস্থলে আনতে পারাটাই যেন দেশের উন্নয়ন এবং নারী অধিকারের বাস্তবায়ন। এগুলোকে উন্নয়ন তখনই মনে হবে যখন পাশ্চাত্যের উন্নতিকে বিশ্বাস

---

[৭৯] ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসের ১২ তারিখ। Marina Del Rey Marriott Hotel-এ চলছে NARTH (National Association for Research & Therapy of Homosexuality) এর কনফারেন্স। শতাধিক মনোচিকিৎসকের সামনে American Psychological Association (APA)-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট Nicholas Cummings, Ph.D. উচ্চারণ করলেন কিছু অপ্রিয় সত্য।

-সমাজকর্মীরা American Psychological Association-কে বাধ্য করছে তাদের হয়ে কথা বলতে। এমন সামাজিক অবস্থান নিতে জোর করছে, যার পক্ষে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।

-তখনই APA কোন রিসার্চ পরিচালনা করে, যখন তারা জানে যে রেজাল্ট কী হবে। সম্ভাব্য যে ফল পক্ষে আসবে, তেমন রিসার্চই কেবল অনুমোদন দেওয়া হয়।

-যখন মিস্টার Cummings ও আরেক মনোবিজ্ঞানী Rogers Wright, Ph.D একটা বই লিখছিলেন Destructive Trends in Mental Health নামে, তখন তারা আরও কিছু সহকর্মীর সাহায্য চান। তারা কেউই সাহায্য করেনি বরখাস্ত হবার ভয়ে কিংবা পদোন্নতি বঞ্চিত হবার ভয়ে। বেশি ভয় পেত তারা 'gay lobby' বা 'সমকাম সমর্থক'দেরকে, যারা APA-তে খুবই শক্তিশালী।

এই হচ্ছে পশ্চিমা বিজ্ঞান ও গবেষণার বাস্তবতা। এইসব রিসার্চের ভিত্তিতে ইসলামকে সন্দেহ করা কতটুকু যৌক্তিক?

https://www.josephnicolosi.com/collection/psych-association-loses-credibility-say-insiders

করা হবে। উন্নতির ইসলামি স্কেল দিয়ে দেখলে আপনি নারীর সামাজিক ও পরিবারিক অধিকার, তার মাতৃত্বের সংরক্ষণ, পরিবার গোছানো, সন্তান প্রতিপালন এবং শিশুর সুস্থতা ও পূর্ণাঙ্গ মানসিক বিকাশের মাঝেই উন্নতি খুঁজে পাবেন। নারীর ক্যারিয়ারের সম্পর্ক তার মাতৃত্বের সাথে; মাথাপিছু আয় বাড়ানোর সাথে নয়। মাতৃত্ব-ই নারীর ক্যারিয়ার। এই পুঁজিবাদী বিশ্বে নারীর পারিবারিক ভূমিকার কোনো বাজারমূল্য নেই। নেই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এর হিসাব। কিন্তু ইসলামে এর কোনো বিকল্প নেই। পুঁজি দিয়ে সমাজ ও পরিবারের প্রতি নারীর এই অবদান ক্রয় করা সম্ভব নয়। বাজারমূল্যের চেয়েও অনেক ঊর্ধ্বের বিষয় এই ভূমিকা, যাকে পরিমাপ করার মতো ভারী কোনো মানদণ্ড নেই পাশ্চাত্য সমাজে। অথচ আলকুরআন ছোট্ট একটি বাক্যে কত সুন্দর মূল্যায়ন করেছে! ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা একে অন্যের পরিপূরক। একজনের কমতিকে আরেকজন পূরণ করো, এভাবে তৈরি হয় পরিপূর্ণতা।'[৮০]

আপনি যদি পাশ্চাত্যের মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠ নারী খোঁজেন তা হলে খাদিজা, আয়েশা, ফাতেমার মতো উম্মাহর আদর্শ মেয়ে, স্ত্রী ও মায়েদের শ্রেষ্ঠ হিসাবে আবিষ্কার করতে পারবেন না। তাদেরকে আপনার কাছে সেকেলে, বস্তাবন্দি, অসহায়, ব্যর্থ মনে হবে। অথচ এই পৃথিবীতে তারাই সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন নারী। একজন নারী যতই মমতাময়ী ও সাংসারিক হোক, আদর্শে-চরিত্রে-গুণে যতই উন্নত হোক, পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে সে ব্যর্থ নারী; যদি না সে টাকা কামাই করছে। কাজে-কর্মে আত্মবিশ্বাসী একজন সফল গৃহিণীও এই মানদণ্ডে ব্যর্থ ও অসফল। এখানে ক্যারিয়ারই সবকিছু। এজন্য দেহ বিক্রি করে, হাজারো পুরুষের সাথে ঢলাঢলি করে যেসব নারী কথিত ক্যারিয়ার গড়ছে, নারীবাদীদের দৃষ্টিতে তারাই সফল। তারাই ফেমিনিস্টদের আইডল। তাদের মতে অর্থই নির্ধারণ করবে নারীর মূল্যমান।

ফেমিনিজমের মোকাবিলায় পাশ্চাত্যের এই বিশ্বাসগুলোতে আঘাত করার পাশাপাশি আমাদের ইসলামপ্রদত্ত নারী অধিকার সমাজে বাস্তবায়ন করার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এই জায়গাটায় আমাদের চরম

---

[৮০] সুরা বাকরা, আয়াত ১৮৭

পর্যায়ের অবহেলা রয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পার্শ্ববর্তী শিরকি সমাজের প্রভাবে এবং ইসলাম পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে নারীদের সাথে এমন কিছু বিষয় জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা ইসলামে অনুমোদিত নয়। অথচ সাধারণ মুসলিমরা এগুলো ইসলামি নির্দেশনা বলে বিশ্বাস করে আসছে। যেমন মহর আদায়ে গড়িমসি করা, সম্পদের মিরাস এবং পারিবারিক অধিকার যথাযথরূপে আদায় না করা। আমরা যখন পশ্চিমা নারীবাদের বিরুদ্ধে কথা বলব তখন ইসলামপ্রদত্ত নারীর অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া একপ্রকার ভণ্ডামি।

বর্তমান মুসলিমসমাজে নারীরা যে দুটি প্রাপ্য থেকে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হচ্ছে, তা হলো মহর এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তি। নারীদের মিরাস চাওয়াকে নির্লজ্জতা এবং ঘৃণার চোখে দেখা হয়। ভাইয়েরা ইমোশনাল ব্লাকমেইল করে দায়সারাভাবে কিছু টাকা দিয়ে বোনদের এই অধিকার কেড়ে নেয়। তাদেরকে বঞ্চিত করে প্রাপ্য অধিকার থেকে। আর স্বামীরা মহরকে অঘোষিতভাবে রহিতই করে দিয়েছে সমাজ থেকে। মহর এখন কাগুজে সংখ্যা ছাড়া কিছুই না। অনেকে তো সারাজীবন স্ত্রীর ভরণ-পোষণকেই মহর হিসেবে গণ্য করে থাকে। অথচ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান স্বামীর উপর আলাদা ওয়াজিব। মহরের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

আমাদের সমাজে নারী নির্যাতন ও হেনস্তার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো যৌতুক। পূর্বনির্ধারিত কিংবা কাঙ্ক্ষিত অর্থ বা বস্তু না পেলে সারাজীবন বউয়ের উপর এর শোধ তোলে স্বামীর পরিবার। যৌতুকের জের ধরে বহু নারী অকালে ঝরে পড়ে। অসংখ্য নারী শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। আবার অনেকে সারাজীবন হজম করে যায় নানারকম খোটা ও কটু কথা। নারীর উপর এই যৌতুকের বোঝা ইসলাম চাপিয়ে দেয়নি। দিয়েছে হিন্দুপ্রভাবিত সমাজ। ইসলামে যৌতুকের অর্থ সম্পূর্ণ হারাম। স্ত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় কোনো প্রকার উপঢৌকন এসে গেলে ভিন্ন কথা। কিন্তু চুক্তি করে কিংবা পূর্বাকাঙ্ক্ষা থেকে সম্পদ না পেয়ে স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালানো কিংবা তাকে কটু কথা শোনানো সম্পূর্ণ জুলুম। ইসলামে এর কোনো বৈধতা নেই।

নারী-পুরুষের ব্যাপারে যৌথভাবে ইসলামে যে নির্দেশনা রয়েছে, তাকে যদি কেউ একতরফাভাবে দেখে তা হলে সে ইসলামের ভারসাম্য বুঝতে পারবে না। যেমন: কেউ শুধু নারীদের প্রতি ইসলামের নির্দেশনা দেখল; তাদেরকে স্বামীর সন্তুষ্টি হাসিলের নির্দেশ করা হয়েছে, ঘরের ভেতরই তাদের মূল অবস্থান স্থির করা হয়েছে ইত্যাদি; তখন সে ভাববে ইসলাম নারীদের অবহেলা করেছে এবং পুরুষদের বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। আবার কেউ পুরুষদের প্রতি ইসলামের নির্দেশনাগুলো দেখল; পুরুষদের চারিত্রিক সার্টিফিকেট বউদের হাতে, নারীর ভরণ-পোষণ, আবাসন, ঘরোয়া কাজসহ সবধরনের অর্থনৈতিক দায়ভার পুরুষদের কাঁধে তখন সে মনে করবে ইসলাম পুরুষদের উপর জুলুম করেছে। অথচ ব্যাপার তা নয়। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ এবং সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা। তার পূর্ণতা ও সামগ্রিকতা বাদ দিয়ে খণ্ডাংশ নিয়ে পড়ে থাকলে ফ্যাসাদ হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীপুরুষ কেউ কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং একজন অপরজনের পরিপূরক। তাদের মধ্যকার সম্পর্কটা প্রতিযোগিতার নয়; ভালোবাসার। আল্লাহ বলেন,[৮১] 'তোমরা একে অন্যের পোশাকস্বরূপ'।[৮২]

ইন্টারফেইথ

ইন্টারফেইথ শব্দের অর্থ 'আন্তঃধর্ম'। বর্তমান মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে বড় ফেতনা হচ্ছে ইন্টারফেইথ। এর সম্পর্ক মূলগতভাবে পাশ্চাত্য বিশ্বাসগুলোর সাথে হলেও এটি অনেক আগেই একটি স্বতন্ত্র ও সক্রিয় মতবাদে রূপ নিয়েছে। ইন্টারফেইথের মূলকথা হলো, ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মকেও ধর্মীয় মর্যাদা দেওয়া এবং অন্য ধর্মের জন্য মুসলিমদের মাঝে ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ও সহানুভূতি প্রতিষ্ঠা করা। বিভিন্ন নামে এই মতবাদ মুসলিম সমাজে প্রচারিত হয়ে থাকে। যেমন: ইন্টারফেইথ ডায়ালগ, ইন্টারফেইথ হারমোনি, ইন্টারফেইথ এলায়েন্স ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য আকিদা স্বাধীনতা ও সমতার সাথে ইন্টারফেইথ বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। পাশ্চাত্য স্বাধীনতার মূলকথা হলো, ভালো-মন্দ

---

[৮১] সুরা বাকারা, আয়াত ২৮৬

[৮২] নারীবাদ সম্পর্কে বাংলাভাষায় সবচেয়ে সুন্দর গ্রন্থ হলো ডা. শামসুল আরেফীন শক্তির ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২ বইটি। আগ্রহী পাঠকগণ বিস্তারিত সেখানে পাঠ করতে পারেন

নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই স্বাধীন। আর এই স্বাধীনতা ব্যবহার করে প্রত্যেকের নির্ধারিত চয়েজই সত্য এবং সমান। এটা হলো পাশ্চাত্য সমতা। ইন্টারফেইথের ক্ষেত্রে এই দুই বিশ্বাস কাজ করে। যে ব্যক্তি মেনে নেবে যে 'ভালোমন্দ নির্ধারণ করার অধিকার যেকারো রয়েছে'; 'ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত নয়'; 'আর প্রত্যেকের চয়েজ-করা বিষয়ই সত্য ও সমমান'। সে তখন এটাও বিশ্বাস করবে যে, 'প্রত্যেকের পালন-করা-ধর্মই সত্য এবং তা সমঅধিকার ও মর্যাদার দাবি রাখে'। ইসলামকেই তখন সে একমাত্র সত্য হিসেবে মানবে না; অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দীন ইসলাম।[৮৩]

বাংলাদেশে এই ইন্টারফেইথ বিশ্বাস প্রচারে 'কোয়ান্টাম মেথড' অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।[৮৪] এ ছাড়াও বিশ্বব্যাপী কাজ করছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। দুঃখজনক হলেও সত্য, মুসলিমবিশ্বের অনেক আলেম, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং রাষ্ট্রপ্রধান এসব সংগঠনের মূলে কাজ করছে কিংবা তাদের প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। গত বছর আবুধাবিতে 'আব্রাহামিক ফ্যামিলি হাউজ' নামে যেই কমপ্লেক্সের ভিত্তি স্থাপন করা হয়, সেখানে সব ধর্মের উপাসনালয় একসাথে নির্মাণ করা হবে। ২০২২ সালে এই প্রজেক্টের কাজ সমাপ্ত হবে। এই প্রজেক্টটি একটি ইন্টারফেইথ প্রজেক্ট। এ ছাড়া রাশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Temple of all Religions নামে কিছু উপাসনালয় তৈরি হচ্ছে, যেখানে সব ধর্মের উপাসনা হবে একসাথে। অত্যন্ত কৌশলে এখানে কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্য। আন্তর্জাতিক কিংবা আঞ্চলিক কিছু সংগঠন আলেমদের নিয়ে ইন্টারফেইথ ডায়ালগ অনুষ্ঠান করছে। মাদরাসার আঙিনাতেও তারা এ ধরনের অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছে। ধর্মীয় সম্প্রীতির নামে সাধারণ মুসলিমদের ইন্টারফেইথ

---

[৮৩] সুরা আলে ইমরান, আয়াত-১৯

[৮৪] কোয়ান্টাম সম্পর্কে জানতে 'ইসলাম ও কোয়ান্টাম মেথড' বইটি পড়া যেতে পারে

বিশ্বাসের দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কার্যতভাবে ইন্টারফেইথ সেক্যুলারিজমেরই ভিন্ন নাম।

মুক্তচিন্তা

পাশ্চাত্যের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া আরেকটি আন্দোলন হলো মুক্তচিন্তা। এই মুক্তচিন্তার সম্পর্কও পাশ্চাত্য স্বাধীনতার সাথে। মুক্তচিন্তার অর্থ হলো, চিন্তার ক্ষেত্রে ওহি, ধর্ম ও প্রথাগত বলয় থেকে স্বাধীন হয়ে শুধু অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ মানবীয় আকল (যুক্তি) ব্যবহার করা। মানবীয় আকলের ঊর্ধ্বে যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করা এবং তার উপর নোংরা আক্রমণ করা।

কিন্তু ইসলাম কখনো মুক্তচিন্তার সমর্থন করে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার বান্দাকে ওহির বিধিবদ্ধতার বাইরে চিন্তা করার অনুমতি দেননি। ওহির মানদণ্ডে আকলের ব্যবহার করা তার নিকট প্রশংসনীয় কাজ। আল্লাহ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

> আমি মানুষ ও জিনজাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য।[৮৫]

যখন তিনি আমাদের সৃষ্টিই করেছেন তার দাসত্বের জন্য, তখন আমাদের 'আকলের দাস' হওয়ার অর্থ হলো তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা।[৮৬]

উপরে আলোচিত বিষয়গুলো বড় কিছু দৃষ্টান্ত মাত্র। পাশ্চাত্যের প্রতিটি দাবি ও আন্দোলনের পেছনে এই স্বাধীনতা-সমতা-উন্নতির বিশ্বাসগুলোই খুঁজে পাবেন। সমকামিতা, পতিতাবৃত্তি, অজাচার, ট্রান্সজেন্ডারসহ তাদের সব নোংরা আয়োজনের বৈধতার জন্য তারা এই তিনটি বিশ্বাসকেই যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করে। খুব সূক্ষ্মভাবেই মুসলিমদের মাঝে এই ধারণাগুলো জট বেঁধে বসেছে। নিজেদের অজান্তেই তারা এই বিশ্বাসগুলোকে ধারণ

---

[৮৫] সুরা জারিয়াত, আয়াত ৫৬

[৮৬] এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে 'ইসলাম ও মুক্তচিন্তা' বইটি পড়া যেতে পারে

করছে, যা তাকে ইসলামের সামগ্রিক চেতনা ও আদর্শ থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তাকে বের করে দিচ্ছে ইসলামের গণ্ডি থেকে।

পাশ্চাত্য স্বাধীনতা অস্বীকার করে আল্লাহর আবদিয়্যাতকে। পাশ্চাত্য সমতা প্রত্যাখ্যান করে ইসলামের ন্যায্যতাকে। পাশ্চাত্য উন্নতির ধারণা ছুড়ে ফেলে তাকওয়ার মানদণ্ডকে। আমাদের মুক্তি স্বাধীনতায় নয়; আবদিয়্যাতে, আল্লাহর দাসত্বে। আমাদের প্রাপ্তি সমতায় নয়; ন্যায্যতায়। আমাদের উন্নতি পুঁজিতে নয়; তাকওয়ায়।

হিউম্যানিজম : আইন ও অথরিটি

পাশ্চাত্য স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ইতোপূর্বে আমরা করে এসেছি। এই তিনটি হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি। উল্লিখিত তিন বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে আইনিপ্রক্রিয়া ও প্রস্তাবনা রচিত হয়েছে, তাকে আমরা হিউম্যান রাইটস নামে চিনি। পাশ্চাত্য বিশ্ব এই হিউম্যান রাইটসকে পরম ও অপরিবর্তনীয় মনে করে এবং এর আলোকেই সমস্ত কিছু তারা বিবেচনা করে। সেক্যুলার রাষ্ট্রগুলোর যেকোনো প্রস্তাবনা এবং আইন পাশের ভিত্তি হিসেবেও কাজ করে এই হিউম্যান রাইটস। সামনে বিষয়টি স্পষ্ট করা হবে ইনশাআল্লাহ।[৮৭]

যারা এই হিউম্যান রাইটস-এর চর্চা করে এবং এর উপর বিশ্বাস রাখে, তাদের বলা হয় Human Being বা ব্যক্তিমানব। হিউম্যান বিয়িং নিছক কোনো মানুষ নয়। সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অমুখাপেক্ষী মনে করে। সমস্ত জীবনব্যবস্থা ও দর্শনকে সে মূল্যায়ন করে পাশ্চাত্য স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতির ভিত্তিতে। পাশ্চাত্য সভ্যতার পুরো কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে এই একটি ব্যক্তিসত্তাকে কেন্দ্র করে। আধুনিক কিংবা আলোকিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে হিউম্যান বিয়িং হওয়া। একজন শিক্ষিত মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিউম্যান বিয়িং হওয়া। কেউ যদি হিউম্যান বিয়িং না হতে চায় তা হলে পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে সে মানুষ থাকে না, অমানুষ হয়ে যায়। তার জান মাল ইজ্জত সব বৈধ হয়ে যায় পশ্চিমা বিশ্বের আইনের কাছে।

আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে পুরো বিশ্বে হিউম্যান রাইটস-এর যে স্লোগান বিদ্যমান, তা কখনোই কোনো মানুষের অধিকার হতে পারে না।

---

[৮৭] জাতিসংঘ কর্তৃক নির্মিত হিউম্যান রাইটস চার্টারও এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই করা হয়েছে। এই চার্টারের অধিকাংশ ধারাই ইসলামি শরিয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক। বিস্তারিত দেখুন- তাআরুফে তাহজিবে মাগরিব, প্রফেসর মুফতি মুহাম্মাদ আহমাদ- ১৫৯-১৭৭ পৃষ্ঠা।

কারণ, এর ভিত্তি রাখা হয়েছে এমন এক সত্তার উপর, যাকে মানুষ বলা ভুল। তাকে 'আল্লাহর দাসত্ব অস্বীকারকারী' শয়তান বলাই যথোপযুক্ত। এমন সত্তার নাম হলো হিউম্যান বিয়িং।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো 'হিউম্যান বিয়িং' নামক সত্তাকেই একমাত্র মানুষ মনে করে। অন্যরা হলো বর্বর, অসভ্য; পৃথিবীতে বসবাসের অযোগ্য। তাই এদের জন্য কোনো মানবাধিকার নেই। এদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হোক, হিংস্র পশুর শিকার বানানো হোক কিংবা যত নির্মম আচরণই তাদের সাথে করা হোক, এতে মানবাধিকার লঙ্ঘন হবে না।[৮৮] মানবাধিকার তখনই লঙ্ঘন হবে, যখন কেউ ইসলাম বাস্তবায়ন করবে কিংবা বাস্তবায়ন করতে চাইবে।

নিশ্চিতভাবেই ইসলাম কথিত আন্তর্জাতিক হিউম্যান রাইটসকে প্রত্যাখ্যান করে। ইসলামের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলামে হুকুকুল ইবাদের কনসেপ্ট আছে। যার অর্থ হলো বান্দার হক, গোলামের অধিকার। পক্ষান্তরে হিউম্যান রাইটস এমন সত্তার অধিকার, যে আল্লাহর দাসত্ব অস্বীকার করে, যে নিজের কুপ্রবৃত্তি ও মানুষের বেঁধে দেওয়া বিধানের গোলামি করে। ইসলামে বান্দার অধিকার ও তার সীমা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। অধিকার এমন কোনো বিষয় নয়, যা নিজে নিজেই নির্ধারিত হয়। বরং কোনো কর্তৃপক্ষ বিশেষ উদ্দেশ্যে তা নির্ধারণ করে থাকে। একজন মুমিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে নির্ধারণ-ক্ষমতার অধিকারী মানবে। আর একজন কাফের মানবে মানুষকে। যে আল্লাহর এই ক্ষমতা মেনে নেবে, সে মুসলিম থাকবে আর

---

[৮৮] এজন্যই ১২ লক্ষ আফগানের রক্তের কোনো দাম নেই,

২৪ লক্ষ ইরাকি হত্যার কোনো জবাবদিহিতা নেই ,

১০ লাখ গৃহহীন ফিলিস্তিনির কোনো মানবাধিকার নেই,

আড়াই লাখ লিবিয়ান স্রেফ খড়কুটো,

সাড়ে ৬ লাখ সোমালিয়ান, সাড়ে ৩ লাখ সিরিয়ান, দেড় লাখ ইয়েমেনির বাঁচার কোনো অধিকার ছিল না।

সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে ৬০ লক্ষ লোকের প্রাণ নেওয়া আমেরিকার জন্য বৈধ। কারণ, আক্রান্তরা 'ব্যক্তি' না, হিউম্যান বিয়িং না। এরা মুসলিম, এরা আবদ, এরা আল্লাহর দাস। এজন্য সবাই চুপচাপ।

যে আল্লাহর ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করে মানুষের ক্ষমতায়নের স্বীকৃতি দেবে, সে কাফের হয়ে যাবে।

আমরা অনেক সময় জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কোনো কোনো সিদ্ধান্ত বা কাজের সমালোচনা করি মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে। বুদ্ধিবৃত্তিক জায়গা থেকে এটা অনুপকারী এবং পরাজিত পদ্ধতি। বরং আমাদের দরকার ছিল তাদের হিউম্যান রাইটস চার্টারকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা। আমরা যদি আন্তর্জাতিক হিউম্যান রাইটস চার্টার মেনে নিয়ে প্রশ্ন করি 'শরিয়াহ আইনে কেন মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়', তা হলে উত্তর আসবে 'এটা পাশ্চাত্য ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে প্রত্যাখ্যান করে।' আর জাতিসংঘের পুরো হিউম্যান চার্টারই তৈরি হয়েছে পাশ্চাত্য স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতির ধারণাকে ভিত্তি করে। স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতির পাশ্চাত্য ধারণার সাথে স্পষ্টতই ইসলামের মৌলিক সংঘর্ষ রয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক হিউম্যান রাইটস মোতাবেক শরিয়াহ আইন বর্বর ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

সুতরাং আমাদের প্রশ্নবিদ্ধ করতে হবে হিউম্যান রাইটস নামক কুফুরি আয়োজনকে। এই টার্মকে ঢাল বানিয়ে জগতে বৈধতা পাচ্ছে সমস্ত অন্যায়-অনাচার, বেহায়াপনা-বেলেল্লাপনা, অশ্লীলতা-পাপাচার, কুফর-শিরক। আর নিষিদ্ধ হচ্ছে আল্লাহর দাসত্ব ও ইসলামি শরিয়াহ। আজ সমকামিতাকে মানবাধিকার বলা হচ্ছে, জিনাকে মানবাধিকার বলা হচ্ছে আর এগুলোর শরয়ি দণ্ডবিধিকে মানবাধিকারের লঙ্ঘন বলা হচ্ছে কীসের ভিত্তিতে?[৮৯] এই হিউম্যান রাইটস চার্টারের ভিত্তিতে। তাই

---

[৮৯] ২০১৯ সালের এপ্রিলে ব্রুনাইয়ে ইসলামি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করার ঘোষণা আসার পর জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থার পক্ষ থেকে এমন সিদ্ধান্তকে বর্বর এবং নিষ্ঠুর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন হিউম্যান রাইটস সংস্থা এবং কর্মী এটিকে মানবাধিকারের লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করে। হিউম্যান রাইটস সংরক্ষণের নামে তারা শরিয়াহ আইন বাতিল করার দাবি তোলে:

https://www.kalerkantho.com/amp/online/world/2019/04/04/754920)

২০২০ সালের এপ্রিলে এসে সেই একই যুক্তিতে সৌদি থেকে বেত্রাঘাত করে শাস্তি প্রদানের বিধান সরিয়ে নেওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছে:

নিউইয়র্ক টাইমস- https://tinyurl.com/yc8frzdx

আলজাজিরা- https://tinyurl.com/y9z2sc2m

আমাদের হিউম্যান রাইটস-এর ধারণা প্রত্যাখ্যান করে হুকুকুল ইবাদের ধারণায় ফিরে আসতে হবে। মুসলিম হিসেবে আমরা আল্লাহর দেওয়া অধিকারেরই স্বীকৃতি দিই। এ ছাড়া সবকিছুকেই অনধিকার চর্চা এবং বান্দার অধিকার লঙ্ঘন মনে করি।

হিউম্যান রাইটস ও হিউম্যান বিয়িং মিলে হয় হিউম্যানিজম। হিউম্যানিজমের কালিমা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল ইনসান'। মানুষ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। পুঁজিবাদ, সমাজবাদসহ সব মতবাদ এই কালিমা বিশ্বাস করে। তাই এখানে আমরা সমাজবাদকে আলাদা করে আলোচনায় আনব না। বর্তমান সমাজতান্ত্রিক ব্লকগুলোও এই কালিমাতে বিশ্বাস করে। তাদের পলিসি বাস্তবায়নের পদ্ধতিই শুধু ভিন্ন। তারাও হিউম্যানিজমের চর্চা করে। সব মতবাদের মধ্যমণি হলো এই হিউম্যানিজম।

হিউম্যানিজমের নানা মুখরোচক স্লোগানে সাধারণ মুসলিমদের পাশাপাশি অনেক ইসলামি ব্যক্তিত্ব প্রতারিত হচ্ছেন। বিভিন্ন সংস্থা মানবসেবার নাম করে মুসলমানদের ঈমানি গাইরাত ও মর্যাদাবোধ নষ্ট করে দিচ্ছে। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার নামে কুফুর ও শিরকের প্রতি মুমিনের সহজাত ঘৃণাকে বিলুপ্ত করে তাকে কুফুরে লিপ্ত করছে। তার কাছে তখন ওয়ালা-বারার মতো ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হয়ে যায় উগ্রবাদ। 'মুসলিম হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে ভাবতে হবে' এইজাতীয় নীতিবাক্যের আড়ালে ব্যক্তির চিন্তাচেতনা ও জীবনধারা থেকে দীনের প্রভাব বিলুপ্ত করে দেওয়াই হিউম্যানিজমের প্রধান লক্ষ্য।

হিউম্যানিজম : মুসলমান নাকি মানুষ?

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের অন্যতম প্রধান বিষয় হলো 'হিউম্যানিজম', যাকে বাংলায় মানববাদ বলা হয়। তবে মানববাদ না বলে 'মানবপূজা' শব্দটাই এই ক্ষেত্রে যথার্থ হয়। হিউম্যানিজম মূলত ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন থেকে ধর্মকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করার মৌলিক ধারণা। পুরো পশ্চিমা সভ্যতা ও পুঁজিবাদ দাঁড়িয়ে আছে এই একটা চিন্তার উপর। আদতে মানুষ এবং মুসলিম বিপরীতমুখী

বিবিসি- https://tinyurl.com/y78xsden

কোনো বিষয় নয় যে, এর যেকোনো একটি বেছে নিতে হবে। একজন ব্যক্তি একইসাথে মানুষ এবং মুসলিম হতে পারে। তা হলে এই বিতর্ক কেন? কারণ, মানুষ (human) বলতে পশ্চিমারা দীনমুক্ত যে স্বাধীন সত্তাকে বুঝায়, ইসলাম তার অনুমোদন করে না। পশ্চিমা মানববাদ আজ মানবিকতার বৈশ্বিক স্ট্যান্ডার্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু ইসলাম মানববাদের এমন কার্মকাণ্ড মেনে নেয় না। আমাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে পশ্চিমাদের যে বল্গাহীন স্বাধীনতার মানববাদ তা দিয়ে একজন মুসলিমের মুসলিম পরিচয়ের যে দাবি ও গর্ব, তাকে সংকটে ফেলবার জন্যই এই বিতর্ক। পশ্চিমাদের কাছে 'মানুষ' নিছক আকৃতিগত বিষয় নয়; বরং তা হচ্ছে একটি দর্শন (Epistemological Concept), যা স্রষ্টা কিংবা অন্য কোনো অথরিটির কর্তৃত্ব থেকে দায়মুক্ত। নিঃসন্দেহে যা কিছু ইসলাম নয় এবং যে মুসলিম নয়, ইসলাম তাকে নাকচ করে; কিন্তু এই অবস্থাকেও ইসলাম তার প্রতি ইনসাফ করে। তবে অবশ্যই সেই ইনসাফ হবে ইসলামের সংজ্ঞায়িত অধিকার। পশ্চিমা লাগামহীন স্বাধীনতার অধিকার নয় যে, মানুষ যা ইচ্ছা তা-ই করবে। ইসলামে মানবাধিকারের প্রথম সবক হচ্ছে মানুষকে তার স্রষ্টার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অথচ পশ্চিমা মানবাধিকারের দাবি হচ্ছে মানুষকে এই অধিকার দেওয়া যে সে নিজেই তার স্রষ্টা। একজন মুসলিম কখনো এটা মেনে নিতে পারে না। আমি কি আল্লাহর দাসত্ব অস্বীকারকারী পশ্চিমা 'হিউম্যান' নাকি আল্লাহর দাসত্ব স্বীকারকারী 'মুসলিম'? প্রশ্ন হলো এটা। এবার আপনার দায়িত্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার।

সুতরাং হিউম্যানিজমের ধারণা অনুযায়ী মানুষের প্রকৃত অবস্থান বান্দা নয়; বরং স্বাধীন (Autonomous) এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা (Self-determined)। সেক্যুলারিজম খুব জোরালোভাবেই দাবি করে যে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন করার জন্য আমাদের 'ইনসানিয়্যাত' তথা মানবতার ভিত্তিতে ভাবা শিখতে হবে; কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম বর্ণ ও বংশের ভিত্তিতে নয়। অর্থাৎ সমাজব্যবস্থার ভিত্তি এমন কোনো বিষয় হতে হবে, যা আমাদের সবার মাঝেই আছে আর তা হলো 'ইনসানিয়্যাত'। পশ্চিমাবিশ্ব এই ধারণাকে 'হিউম্যান রাইটস' নাম দিয়ে একটি পৃথক ধর্ম

বানিয়ে নিয়েছে। আর গোটা পৃথিবীকে তারা নিজেদের বানানো এই মাপকাঠি দিয়েই বিচার করছে।

সেক্যুলাররা তাদের 'হিউম্যানিজম' ধারণার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য একটি কমন প্রশ্ন তোলে—'আমাদের আসল পরিচয় মানুষ নাকি মুসলিম!' তাদের নিকট এই প্রশ্নের ব্যাপক এবং প্রচলিত উত্তর হলো, আমাদের আসল পরিচয় 'আমরা মানুষ'। আমাদের নিজেদের প্রথমে মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখা লাগবে। মুসলিম হিসেবে চিন্তা করলে মাত্র কয়েক কোটি মানুষ নিয়ে ভাবতে হবে। কিন্তু মানুষের জায়গা থেকে চিন্তা করলে পুরো পৃথিবীর সকলেই এসে যাবে। মূলত এই ধারণার মাধ্যমেই সেক্যুলারিজম ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয়ে রূপান্তরিত করেছে। কারণ হিউম্যানিজমকে মাপকাঠি হিসেবে মেনে নেওয়ার পর এটাই যৌক্তিক মনে হবে যে সামাজিক জীবনের ভিত্তি এমন কোনো বিষয় হওয়া উচিত, যা সবার জন্যই মূল এবং সবার মাঝেই আছে। যেন একটি সামগ্রিক জীবনাদর্শ অস্তিত্ব লাভ করতে পারে। যদি ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ কায়েম হওয়া সঠিক হয় তা হলে বংশ বর্ণ ইত্যাদি বিষয়ের ভিত্তিতে সমাজ কায়েম হওয়াকেও সঠিক মনে করতে হবে। মানুষের মূল অবস্থান 'ইনসানিয়্যাত' মেনে নিলে ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত বিষয় হয়ে যায়। এটা এর আবশ্যিক ফল। আর এটাই সমস্ত সেক্যুলার রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তি (সেটা লিবারেলিজম হোক কিংবা সমাজতন্ত্র)। সেক্যুলারিজম দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো এমন জীবনব্যবস্থা, যা ওহির পরিবর্তে মানবীয় বিবেকের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, কোনো কোনো ইসলামি বুদ্ধিজীবী যখন সেক্যুলারদের সাথে কথা বলে তখন তারা হিউম্যানিজমের ভিত্তিতে কথা বলে। ফলে দেখা যায়, হয়তো তারা আলোচনায় পরাজিত হয়; কিংবা অত্যন্ত দুর্বল এবং ঠুনকো দলিলের আশ্রয় নেয়। হিউম্যানিজমকে প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত ধর্মকে সামাজিক জীবনে শামিল করার পলিসি বানানো অসম্ভব। আমাদের আলোচিত প্রশ্ন 'আমরা মানুষ নাকি মুসলমান'-এর সুস্পষ্ট এবং অকাট্য উত্তর হবে 'আমি মুসলমান (আল্লাহর সৃষ্টি ও তার কাছে আত্মসমর্পণকারী অর্থে)'। তা হলে আমি কি

মানুষ নই? হ্যাঁ, আমি মানুষও। তবে আমি পশ্চিমা সংজ্ঞায়িত অর্থে মানুষ নই যে, আমি আমারই দাস। মানুষ হওয়া তো একটি সৃষ্টিগত ঘটনা এবং আমার মুসলমানিত্ব প্রকাশের মাধ্যম। আমাদের মূল পরিচয় হলো আমরা গোলাম তথা আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষ হওয়ার পূর্বের কথা হলো আমরা মাখলুক (সৃষ্টি)। আমাদের একজন স্রষ্টা আছেন। এখন মানুষ হওয়ার ব্যাপারটি একটি ঘটে যাওয়া বিষয়ের মতো।

বিষয়টি ভালো করে বুঝার জন্য এভাবে চিন্তা করা যেতে পারে যে যদি আমরা মানুষ না হতাম তা হলে কী হতাম? এর দুটি সুরত রয়েছে। হয়তো ফেরেশতা হতাম নয়তো কোনো প্রাণী, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ হতাম; কিন্তু আমরা যা-ই হই না কেন- সর্বাবস্থায় আমাদের মৌলিকত্ব হলো আমরা মাখলুক। অর্থাৎ অস্তিত্বের সম্ভাব্য প্রতিটি অবস্থাতেই আমাদের মৌলিক অবস্থান একজন আবদ, বান্দা বা গোলামের। এখন আমার গোলামির বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নভাবে হতে পারে। উদাহরণত, আমি যদি পোকা হই, তা হলে আমার 'আবদিয়্যাত'-এর প্রকাশ পোকার সুরতেই হবে। আবার আমি যদি ফেরেশতা হই তা হলে ফেরেশতার সুরতেই আমার আবদিয়্যাতের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। এবার আমি যদি মানুষ হই তবে এটা আমার আবদিয়্যাত প্রকাশের মাধ্যম মাত্র। মোটকথা, আমার সুরত তো পরিবর্তন হতে পারে; কিন্তু আমি যদি সৃষ্টি হই তবে আমার অবস্থান সর্বদা মাখলুক, আবদ এবং বান্দাই থাকবে। কোনোক্রমেই এই অবস্থা পরিবর্তনযোগ্য নয়। আমার সকল অবস্থা এই অর্থে নির্ধারিত যে আমার অস্তিত্বের কিছুই আমি নিজে সৃষ্টি করতে পারি না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেভাবে চেয়েছেন, আমার কোনো ইচ্ছা ছাড়াই, ঠিক সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করার ব্যাপারে বাধ্য ছিলেন না।

সুতরাং প্রমাণিত হলো, আমার সত্তাগত অবস্থান মুসলিম (আবদিয়্যাত)। ইনসানিয়্যাত আমার আবদিয়্যাত প্রকাশের মাধ্যম মাত্র। আবদিয়্যাত ছাড়া আমার ইনসানিয়্যাতের কোনো মূল্য নেই। মুসলমানিত্বকে আবদিয়্যাত দ্বারা ব্যাখ্যা করার কারণ হলো আক্ষরিক অর্থে প্রত্যেক বান্দা মুসলমানই হয়; সে স্বীকার করুক বা না করুক। প্রতিটি মানুষই গোলাম। এখন সে যদি অন্তর ও জবান দ্বারা এর স্বীকৃতি দেয়, তা হলে সে মুমিন ও মুসলিম

(স্বীয় অবস্থান স্বীকারকারী)। আর যদি এটা মেনে নিতে অস্বীকার করে, তা হলে সে কাফের (স্বীয় অবস্থান অস্বীকারকারী)। অন্যভাবে বললে, কাফের কোনো নতুন কিংবা ভিন্ন অবস্থান নয়; বরং মূল অবস্থান অস্বীকারকারী মাত্র।

যখন প্রমাণিত হলো আমাদের মৌলিক অবস্থান বান্দা হওয়া আর ইনসানিয়্যাত আমাদের আবদিয়্যাত প্রকাশ করার মাধ্যম মাত্র, তখন এটা বুঝা খুব সহজ হয়ে গেল যে আমাদের ইনসানিয়্যাতের সেই বহিঃপ্রকাশই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হবে, যাতে আবদিয়্যাত রয়েছে। সেখানে নিজের প্রবৃত্তি ও নফসপূজা থাকলে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ আল্লাহর কাছে আমাদের আবদিয়্যাত প্রকাশ করার একমাত্র পন্থা হলো ইসলাম। এজন্য আমাদের ইনসানিয়্যাত তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ইসলাম অনুযায়ী হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

> যে ইসলাম ছাড়া অন্য জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তা গ্রহণযোগ্য হবে না।[১০]

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

> আল্লাহর কাছে (আবদিয়্যাত প্রকাশের) একমাত্র দীন হলো ইসলাম।[১১]

কেউ কেউ বলতে পারেন মানুষ হওয়ার নিশ্চয় আলাদা কোনো মর্যাদা রয়েছে। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই কথার জবাব উপরের আলোচনাতেই রয়েছে। ইনসানিয়্যাত মূলত আবদিয়্যাত প্রকাশের উত্তম সুরত। আবদিয়্যাতের জন্যই ইনসানকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আশরাফুল মাখলুকাত বলেছেন। কারণ আবদিয়্যাতের সবচেয়ে কঠিন এবং ব্যাপক বিষয় ইনসানের সাথে সংশ্লিষ্ট। পুরো শরিয়ত তাদের সাথেই

---

[১০] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৫
[১১] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯

ব্যাপকভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে রেখেছে, যা অন্য কোনো মাখলুকের সাথে সম্ভব নয়। এখন যেই আবদিয়্যাতের খাতিরে মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হলো, তা-ই যদি না থাকে তা হলে কী করে মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হবে! এজন্য আল্লাহ তাদেরকে পশুর সাথে তুলনা করেছেন; বরং পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট বলেছেন।[১২]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আরেকটি ভুল ধারণা দূর হওয়া উচিত। তা হলো, ধর্মশিক্ষা দেওয়ার আগে বাচ্চাদের মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার ধারণা। অর্থাৎ প্রথমে তাকে শেখানো হবে মানুষ কী? এরপর ধর্মের কথা। বাস্তবে এটাই হিউম্যানিজম তথা মানববাদকে সঠিক প্রমাণের একটি চিত্র। কারণ ধর্মের বাইরে নিজের অস্তিত্ব জানার অর্থই হলো মানুষ তার অস্তিত্বের ক্ষমতা এবং পরিচিতি নিজের মাঝেই সংরক্ষণ করে। এটার অথরিটি তার আছে এবং সেটা নবীদের শিক্ষা ব্যতীতই সম্ভব। অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে 'মানুষ'-ই স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অবস্থান, being without God. প্রশ্ন হলো, নিজেকে ধর্মের বাইরে শুধু মানুষ হিসেবে পরিচয় দেওয়ার কী উদ্দেশ্য? আমি নিজের ইনসানিয়্যাতকে কী ভাবি—আবদিয়্যাত প্রকাশের মাধ্যম, নাকি মৌলিক সত্তা? যদি ইনসানিয়্যাতকে মৌলিক অবস্থান ও সত্তা মেনে নেওয়া হয়, তবে এটাই মানববাদ। আর যদি আবদিয়্যাত প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তা হলে ধর্মের বাইরে নিজেকে পরিচিত করানো কেবল হাস্যকরই নয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষ কুফরও।[১৩]

হিউম্যানিজম কি নিরপেক্ষ হতে পারে?

আমরা অনেকেই মনে করি হিউম্যান রাইটস যৌক্তিক এবং নিরপেক্ষ ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে। এটা সম্পূর্ণ ধোঁকা। হিউম্যান রাইটস মোটেই নিরপেক্ষ নয়। বরং হিউম্যান রাইটস কল্যাণ-অকল্যাণ, ঠিক-বেঠিক ও ভালো-মন্দের একপেশে ধারণাকে আবশ্যিকভাবে লালন করে। সেক্যুলারগোষ্ঠী ধর্মকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে দেখিয়ে মানুষের সমষ্টিগত জীবন থেকে দীনকে সরিয়ে দিতে চায়। যেহেতু ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত

[১২] সুরা আরাফ, আয়াত ১৭৯

[১৩] ইসলামি ব্যাংকারি আওর জমহুরিয়্যত- ১৭২-১৭৫

রাষ্ট্র নিশ্চিতভাবেই সাম্প্রদায়িক হবে, অর্থাৎ সেই রাষ্ট্র কল্যাণ-অকল্যাণ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ ও বৈধ-অবৈধ হওয়ার নির্দিষ্ট ধর্মীয় ব্যাখ্যার বাইরে অন্যসব ব্যাখ্যা বাতিল সাব্যস্ত করবে এবং সেগুলোকে দমন ও পরাজিত করবে। সেজন্য ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে দূরে রাখতে হবে। আর এমন এক কাঠামোর উপর রাষ্ট্রকে দাঁড় করাতে হবে, যা নিরপেক্ষভাবে কল্যাণের সমস্ত ধারণাকে চর্চা করার সুযোগ তৈরি করে দেবে। আর তা হিউম্যান রাইটস-এর মাধ্যমেই সম্ভব। এসব কুযুক্তি দেখিয়ে তারা মানুষকে ধোঁকায় ফেলার চেষ্টা করে।

কিন্তু আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে যে লিবারেল সেক্যুলার রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ ও সহিষ্ণু হওয়ার যে দাবি পশ্চিমা এবং সেক্যুলাররা করে থাকে, তা সম্পূর্ণই মিথ্যা। কারণ, হিউম্যান রাইটসও ভালো-মন্দের নির্দিষ্ট সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা গ্রহণ করে। আর তা হলো 'ভালো-মন্দের সকল ধারণাই সমান ও সমপর্যায়ের', এটা তো নিজেই একটা পক্ষ।[১৪] যে নিজেই একটি পক্ষ, সে আবার নিরপেক্ষ হয় কী করে? হিউম্যান রাইটস-এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই নির্দিষ্ট এই ধারণা সংরক্ষণ করে। এর প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করে। প্রচলিত হিউম্যান রাইটসকে মেনে নেওয়ার অর্থ হলো 'ইসলামই একমাত্র সত্য'— এই মহাসত্য অস্বীকার করা। হিউম্যান রাইটসের প্রকাশ্য ঘোষণা হচ্ছে- 'সব ধর্ম ও মতবাদই ইসলামের মতো সত্য'। সম্ভাব্য কয়েকটি সত্যের মাঝে ইসলামও একটি। এর বাইরে আরো সত্য রয়েছে।

কোনো লিবারেল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কেবল ভালো-মন্দের সেসব ধারণাই মেনে নেয়, যা তার সুনির্দিষ্ট ধারণার পরিপন্থি না হয়। কল্যাণের যে ধারণাই হিউম্যান রাইটস-এর সাথে সাংঘর্ষিক হবে কিংবা যারাই কোনো নির্দিষ্ট ধারণাকে একমাত্র সত্য মনে করে অন্যান্য সবকিছুকে বিলুপ্ত ও

---

[১৪] মূলত পাশ্চাত্যের কাছে 'কল্যাণ'-এর প্রতিষ্ঠিত কোনো ধারণা নেই। তারা যেই স্বাধীনতাকে কল্যাণ হিসেবে মেনে নিয়েছে, তা কল্যাণের ধারণাশূন্য একটা দাবি। absence of any good. এখানে কল্যাণের নির্দিষ্ট কোনো কাম্য বিষয় নেই। তাদের কাছে যেকোনো কিছু কামনা করার অধিকারই আসল কল্যাণ। বলা যায় কল্যাণহীনতাই তাদের কাছে সর্বোচ্চ কল্যাণ হিসাবে বিবেচিত হয়। (ইসলামি ব্যাংকারি আওর জমহুরিয়্যাত, জাহিদ সিদ্দিক মোগল, ২৩০)

পরাজিত করার পরিকল্পনা করবে, তাদেরকে শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে দমন করা হবে। সুতরাং হিউম্যান রাইটস ঐ ধারণা বা আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করে, যা হিউম্যান রাইটস-এর আদর্শ মেনে নেয় না। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা তাদের একটি বুলি মাত্র।

আবার কোনো জনপদের লোকেরা যদি প্রচলিত গণতান্ত্রিক সিস্টেমের মাধ্যমেই ধর্মীয় বিধান মোতাবেক রাষ্ট্র চালাতে চায়, তা হলে হিউম্যান রাইটস তাকেও মেনে নেবে না।[৯৫] কারণ হিউম্যান রাইটস অনুযায়ী এটা মানুষের মৌলিক অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক। মানুষের মৌলিক অধিকার হলো স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতিকে মেনে নিয়ে পাশ্চাত্যের গোলামি করা। এখন কেউ যদি এগুলো অস্বীকার করে দীনের গোলামি করে, আল্লাহর দাসত্ব মেনে নেয় তা হলে সে যেন তার মৌলিক অধিকার প্রত্যাখ্যান করল। তখন সে আর 'হিউম্যান' থাকে না। ফলে তাকে মেরে ফেলাও বৈধ।[৯৬] এটাই হলো হিউম্যান রাইটস-এর নিরপেক্ষতা।

এমনিভাবে যদি একজন মুসলিম নারী কোনো কাফের পুরুষকে বিয়ে করতে চায়, তা হলে নিশ্চিতভাবেই ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র তাকে এই কাজের অনুমোদন দেবে না। কিন্তু যেহেতু হিউম্যান রাইটস-এর দৃষ্টিতে এটা ব্যক্তির অধিকার, তাই তাকে আইনি অনুমোদন এবং রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে। যদি মুসলিমসমাজ উক্ত নারীর উপর নিজেদের বিশ্বাস চাপিয়ে দিতে চায়, তা হলে লিবারেল রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

হিউম্যান রাইটস অনুযায়ী কল্যাণের সংজ্ঞা পরিবর্তিত ও বিভিন্ন হতে পারে। কিন্তু কল্যাণের সংজ্ঞা এভাবে নির্দিষ্ট করা যাবে না যে এটাই একমাত্র কল্যাণ। লিবারেল সেক্যুলার রাষ্ট্রে যা ইচ্ছা তা-ই করা যাবে, তবে হিউম্যান রাইটসের বিরুদ্ধে যায় এমন কিছু করা যাবে না। যেমন: ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া হিউম্যান রাইটস অনুযায়ী ব্যক্তির অধিকার। আর

---

[৯৫] গণতান্ত্রিকভাবে নিরঙ্কুশ বিজয়ের দ্বারা আলজেরিয়ায় 'আন-নাহদা' এবং মিশরের 'মুসলিম ব্রাদারহুড' সরকার গঠন করেছিল, যাদেরকে উৎখাত করেছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়।

[৯৬] পশ্চিমা কর্তৃক সামরিক অভিযানের মাধ্যমে আজকের দুনিয়ার কোটি মুসলিম হত্যার পেছনের যুক্তি ও দলিল এটাই।

ইসলামি শরিয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এখন কেউ যদি এই কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করে, তা হলে সেক্যুলার রাষ্ট্র তাকে শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে দমন করবে। কারণ এটা তাদের স্বাধীনতা-নীতির বিরুদ্ধে যায়।

যেকেউ কল্যাণের ধারণাকে একটি অধিকার হিসেবে চর্চা করতে পারবে; কিন্তু সেই ধারণাকেই একমাত্র কল্যাণ কিংবা অধিকার হিসেবে বিশ্বাস করতে পারবে না এবং তাকে অন্যান্য কল্যাণের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তাও করতে পারবে না। ব্যক্তির এমন চাহিদাকে আইনগতভাবে এবং নৈতিকভাবে অবৈধ ও অগ্রাহ্য করা হবে, যা হিউম্যান রাইটস-এর বিরুদ্ধে যায়। তার প্রাণনাশকে বৈধ ঘোষণা করা হবে। সুতরাং বুঝা গেল লিবারেল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কখনোই নিরপেক্ষ হতে পারে না। বরং তা ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মতোই সাম্প্রদায়িক, Dogmatic এবং intolerant. কারণ উভয় প্রকার রাষ্ট্রই তাদের নিজস্ব কল্যাণের ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক যেকোনো দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেয় না। এজন্যই বিখ্যাত লিবারেল চিন্তাবিদ Rawls বলেছে, 'ধর্মীয় স্বাধীনতাকে কখনোই লিবারেলিজমের জন্য আশংকাজনক হয়ে উঠতে দেওয়া যাবে না। লিবারেল স্বাধীনতা তথা ব্যক্তির ভালো-মন্দ নির্ধারণের অধিকারকে অস্বীকার করে এমন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি দমন করা মহামারিকে রোধ করার মতোই জরুরি।'[১৭]

সুতরাং আমাদের বুঝতে হবে, কল্যাণের সমস্ত ধারণা সমপর্যায়ের মেনে নেওয়া কোনো নিরপেক্ষতা নয়; বরং এটাও একটা পক্ষপাতমূলক মূলনীতি মেনে নেওয়া। আর সেই মূলনীতি হলো, সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দের সকল ধারণা মেনে নেওয়া। নির্দিষ্ট কোনো ধারণাকে একমাত্র সত্য না মানা। এটাও একধরনের পক্ষপাতমূলক অবস্থান। এখানে নিরপেক্ষতা বলতে কিছু নেই।[১৮]

হিউম্যান রাইটস এবং হুকুকুল ইবাদ-এর পার্থক্য

কিছু কিছু মুসলিম চিন্তাবিদের একটি বড় চিন্তাবিভ্রাট হলো, ইসলামি শিক্ষা ও নির্দেশনাকে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশ্লেষণ করা। এরই

---

[১৭] theory of justice
[১৮] প্রাগুক্ত- ১৯৯, ২০১

ধারাবাহিকতায় তাদের একটি ক্রটি হচ্ছে, হুকুকুল ইবাদকে হিউম্যান রাইটস-এর দৃষ্টিতে বুঝা, কিংবা হিউম্যান রাইটসকে হুকুকুল ইবাদ দিয়ে প্রমাণ করা। কেউ কেউ তো হিউম্যান রাইটস-এর অর্থ ভুলভাবে হুকুকুল ইবাদ করা পর্যন্তই ক্ষান্ত থাকে না; বরং আরও আগে বেড়ে তারা দুটোকেই এক মনে করে। এমনকি তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে পৃথিবীকে ইসলামই সর্বপ্রথম হিউম্যান রাইটস-এর দীক্ষা দিয়েছে। বিদায় হজের ভাষণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিউম্যান রাইটস-এর শিক্ষা দিয়েছেন (নাউজুবিল্লাহ)। অথচ পশ্চিমা হিউম্যান রাইটস এবং ইসলামের হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হকের ধারণা কখনোই এক নয়। দুটি দুই মেরুর বিষয়। আল্লাহর আবদিয়্যাত অস্বীকার করে বান্দা যে স্বাধীনতা ও অধিকার অর্জন করতে চায়, সেই হক কখনোই হুকুকুল ইবাদ নয়। বান্দার এই অধিকার নেই যে, সে আল্লাহর আবদিয়্যাত অস্বীকার করে নিজেকে স্বাধীন করার চেষ্টা করবে। এটা তো প্রকাশ্য কুফর।

উভয়ের পার্থক্য সহজভাবে বুঝার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক একটি লিবারেল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দুজন নারী পুরুষ লিভ টুগেদার করতে চায়। এখন প্রশ্ন হলো, এটা করার অধিকার তাদের আছে কি না? যদি এই প্রশ্নের উত্তর কোনো দীনদার ব্যক্তির কাছে জানতে চাওয়া হয় তা হলে তিনি আল্লাহপ্রদত্ত কল্যাণের ধারণা তথা কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে উত্তর দেবেন। একজন মুসলিম আলেম বলবেন, যেহেতু কুরআন-সুন্নাহতে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এজন্য কারোরই লিভ টুগেদারের অধিকার নেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হিউম্যান রাইটসকে সর্বোচ্চ সত্য ও আইন হিসেবে মেনে নেয়, তাকে প্রশ্ন করা হলে সে এই কাজকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেবে। সে বলবে, প্রত্যেক মানুষের এই অধিকার ও স্বাধীনতা রয়েছে যে, নিজের চাহিদা এবং খায়েশ যেভাবে ইচ্ছা পূরণ করবে। এখন যদি তারা দুজন লিভ টুগেদার করে নিজেদের চাহিদা পূরণ করতে চায়, তবে তাদের পূর্ণ অধিকার আছে এটা করার। এই দলিলের ভিত্তিতেই পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে সমকামিতা, ব্যভিচার ও পরকীয়ার মতো নানান অশ্লীলতা এবং পাপাচারকে সাংবিধানিক বৈধতা দেওয়া হয়েছে। একটি লিবারেল রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকেরই অধিকার আছে খোদায়ি প্রত্যাদেশকে বৃদ্ধাঙুল দেখিয়ে হিউম্যান রাইটস-এর আড়ালে এসব জঘন্য কাজের সাংবিধানিক অনুমোদন পাওয়ার।

'হুকুকুল ইবাদ' মহান আল্লাহর নির্দেশনার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। একজন মানুষের (গোলামের) কোনো কাজের অনুমোদন কিংবা নিষেধাজ্ঞা কিতাব-সুন্নাহর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে হিউম্যান রাইটস-এর বৈধতা আসে একজন স্বেচ্ছাচারী ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবিদার মানবসত্তার মাধ্যমে। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তির অধিকার এমন কোনো বিষয় নয়, যার বৈধতা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ফিতরি কানুনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। বরং 'অধিকার'-এর একমাত্র উৎস হবে কুরআন এবং সুন্নাহ। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি তার জীবনের মালিক নয়। এই জীবন তার রবের দান-করা সম্পদ। এজন্য বান্দা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে জীবন পরিচালনা করার অধিকার রাখে না। ফলে আমরা মানুষকে স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করতে পারি না; বরং সে গোলাম এবং বান্দা। পাশাপাশি আমরা তার এমন কোনো অধিকারের দাবিও মেনে নিতে পারি না, যার অনুমোদন খোদায়ি নির্দেশনার বাইরে থেকে গৃহীত হয়েছে। বান্দার অধিকার ততটুকুই, যতটুকু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার নবীর মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর বাইরে বান্দার সমস্ত কার্যক্রমই জুলুম এবং অবাধ্যতা হিসেবে গণ্য হবে। আর তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই মূল ইনসাফ ও আদল। মানুষের এমন কোনো সত্তাগত অধিকার নেই, যার বৈধতার প্রমাণ সে নিজেই এবং সেই অধিকার অগ্রাহ্য করার সুযোগ থাকবে না। হিউম্যান রাইটস-এর অর্থ হলো, মানবাধিকারকে কল্যাণের উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং এই কথার স্বীকৃতি দেওয়া যে মানুষ নিজেই তার মালিক। এমনকি ভালো-মন্দ নির্ধাণের মাপকাঠিও খোদায়ি প্রত্যাদেশ নয়; বরং মানুষের খায়েশ ও প্রবৃত্তি।

অধিকার ও কর্তব্যের সব ধরনের ব্যাখ্যা কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিল করার মাধ্যম হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য ও কল্যাণের ধারণা পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাখ্যায়ও পরিবর্তন আসে। (যেমন) শরিয়াহ প্রবর্তকের পক্ষ থেকে বান্দাকে অধিকার প্রদান করার পেছনে শরিয়াহর উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে হাসিল করার এজেন্ডা থাকে। কিন্তু হিউম্যান রাইটস বান্দাকে যেসব অধিকার প্রদান করে, সেগুলো তার খোদায়িত্বকে পূর্ণ করার সুযোগ তৈরি করতে থাকে। যেহেতু হিউম্যান রাইটস শরিয়াহর এজেন্ডা বাস্তবায়ন এবং আবদিয়্যাতকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হিসেবে মেনে নেয় না, এজন্য তা শরিয়তের বয়ান-

করা অধিকারের ব্যাখ্যা ও সীমা অস্বীকার করে। অন্যদিকে হিউম্যান রাইটস অধিকারের সেই ব্যাখ্যা প্রদান করে, যা সমঅধিকারের ভিত্তিতে এমন সামাজিক কাঠামো তৈরি করে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ খায়েশ বেশি বেশি পূরণ করতে পারে। যেই রাষ্ট্র হিউম্যান রাইটস-এর অনুসারী হবে সেই রাষ্ট্র কখনো শরিয়াহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণ করতে পারে না।

'হিউম্যান' কোনো শাব্দিক ব্যাপার নয় যে শব্দটির অর্থ 'মানুষ' তুলে যেভাবে ইচ্ছা চালিয়ে দেওয়া যাবে। বরং তা ধর্মবিরোধী নির্দিষ্ট এক বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস থেকে বের হয়ে আসা পরিভাষা। **Humanity** মূলত এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের রহস্যজনক ধারণা। এর অর্থ 'মানবতা' নেওয়া মারাত্মক ভ্রান্তি এবং ধোঁকা। **humanity** এর ধারণা ইসলামে মানবসত্তার ধারণাকে পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ **human being** 'আবদিয়্যাত'কে অস্বীকার করে। কান্টের মতে হিউম্যান বিয়িংয়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং আসল অবস্থান হলো **autonomy** তথা খোদায়িত্ব ও স্বেচ্ছাধিকারত্ব।

ইসলামে মানুষ আল্লাহর ইচ্ছার অনুসারী এবং অনুগামী হয় আর হিউম্যান বিয়িংয়ের ধারণায় মানুষ নিজেই নিজের রব বনে যায়। এজন্য হিউম্যানের সঠিক অর্থ মানুষ নয়; বরং শয়তান (**human is actually demon**)। কারণ সে শয়তানের মতোই আপন রবের সাথে বিদ্রোহ করে থাকে। সুতরাং হিউম্যান রাইটস-এর অর্থও তা হলে মানবাধিকার নয়; হবে শয়তানের অধিকার। বিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক মিশেল ফুকো তার **The Order of Things: An Archaeology of the Human Scienes** (1970) বইয়ে ঠিকই বলেছে যে, হিউম্যানের আবিষ্কারই হয়েছে ১৭/১৮ শতকের দিকে (**...man is only a recent invention, a figure not yet two centuries old...**)।[১১] এর পূর্বে হিউম্যানের অস্তিত্ব ছিল না। কারণ সমস্ত ধর্মেই 'ইনসান' ছিল 'আবদ'-এর অবস্থানে। তবে আবদিয়্যাতের ধরন নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যখন হিউম্যানের ধারণা ইসলামে মানুষের মৌলিক অবস্থানের (আবদ) সাথেই সাংঘর্ষিক, তখন 'ইসলামি হিউম্যান রাইটস' পরিভাষা আবিষ্কার করা অনেকটা

---

[১১] **what is Enlightenment**

'ইসলামি কুফর'-এর মতোই। যেভাবে 'ইসলামি খ্রিষ্টবাদ' নামে কিছু হতে পারে না, তেমনি 'ইসলামি হিউম্যান রাইটস' নামেও কিছু হতে পারে না। হিউম্যান রাইটস-এর বিপরীতে ইসলামে 'হুকুকুল ইবাদ'-এর ধারণা আছে; কিন্তু হুকুকুল ইবাদ হিউম্যান রাইটস নয়। বরং তা হলো গোলামের অধিকার; কোনো বিদ্রোহীর অধিকার নয়। ইসলামে হিউম্যানের কোনো অধিকার নেই। কারণ, সে খোদাদ্রোহী। আল্লাহর সাথে বিদ্রোহকারী।

পরিতাপের বিষয় হলো, ইসলামে হুকুকুল ইবাদের মতো ব্যাখ্যা থাকা সত্ত্বেও ইসলামি আন্দোলন এবং মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কেন হিউম্যান রাইটস-এর প্রয়োজন পড়ল? ইসলামি দলগুলোর মূল দাওয়াতই তো হবে হিউম্যান রাইটসকে প্রত্যাখ্যান করা; তার ইসলামি পোশাক প্রস্তুত করা নয়। কারণ মানুষকে ইলাহ বানিয়ে নেওয়া এবং তার উপর ঈমান রাখা কুফুর এবং এটা শিরকের এক নিকৃষ্ট অবস্থান। পাশ্চাত্য ব্যক্তিসত্তা (হিউম্যান বিয়িং), সমাজ-ব্যবস্থা (সোল সোসাইটি), অর্থব্যবস্থা (পুঁজিবাদ) ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (গণতন্ত্র)-কে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মনে না করে বিক্ষিপ্ত অংশ মনে করা মারাত্মক ভুল ও আদর্শিক বিচ্যুতি।

যাই হোক, হিউম্যান রাইটস ফ্রেমওয়ার্ক ইসলামি ইতিহাস ও শিক্ষা থেকে বেরিয়ে আসা কোনো বিষয় নয়। যখন আমরা হিউম্যান রাইটস এবং ডেমোক্রেটিক ফ্রেমওয়ার্ককে এবস্যুলেট হিসেবে গ্রহণ করে ইসলামকে এর প্রেক্ষিতে জাস্টিফাই করতে যাব, তখন একদিকে আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই শক্তিশালী করব। অপরদিকে আমরা নিজেরাও আদর্শিক ও নৈতিক সংকটের মুখে পড়ব। ফলে ডিফেন্সিভ পজিশন থেকে আমরা হয়তো নিজেদের ইতিহাসের বর্ণনাকে বিকৃত করব নতুবা লাগামহীনভাবে নতুন নতুন ব্যাখ্যার আশ্রয় নেব, যা সালাফে সালেহিন থেকে প্রমাণিত নয়।[১০০]

[১০০] প্রাগুক্ত- ১৯৭, ১৯৮, ২০৬, ২০৭

ইসলাম বনাম সেক্যুলারিজম

সমতা, উন্নতি এবং হিউম্যানিজম নিয়ে আলোচনা করার পর লিবারেলিজম, ডেমোক্রেসি এমনকি সেক্যুলারিজম নিয়েও বিস্তারিত আলোচনার তেমন প্রয়োজন থাকে না। তবু সেক্যুলারিজম নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। কারণ সেক্যুলারিজম নিয়ে নতুন নতুন ভ্রান্তি আমাদের সামনে আসছে। এর মৌলিক কনসেপ্ট আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া উচিত। সেক্যুলারিজমের আলোচনায় যাওয়ার আগে দেখতে হবে স্বাধীনতা, সমতা, উন্নতি এবং হিউম্যানিজমের সাথে উল্লিখিত ইজমগুলোর সম্পর্কটা কীরূপ। তা হলেই বুঝা যাবে আলাদা করে সেগুলো নিয়ে আলোচনার তেমন প্রয়োজন কেন হচ্ছে না।

লিবারেল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলো সেই কাঠামো, যা স্বাধীনতা, সমতা, উন্নতি- এককথায় বলতে গেলে হিউম্যানিজমকে প্রথম ও শেষ উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে। মানুষকে হিউম্যান বিয়িং মানার অর্থই হলো তাকে তার খায়েশ অনুযায়ী আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া। অর্থাৎ একটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনপ্রণয়নের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে খায়েশ ও প্রবৃত্তি। ভোট দিয়ে হিউম্যান বিয়িংরা তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজেদের 'উলুহিয়্যাত' চর্চার ব্যবস্থা করে থাকে। নিজেদের আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে তাদেরকে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, সেসব প্রতিনিধির আইনপ্রণয়নের ক্ষমতাপ্রদানের উদ্দেশ্য কখনোই এই নয় যে তারা যা ইচ্ছা আইন করে ফেলবে। এই জনপ্রতিনিধিরাও একটি সর্বোচ্চ কল্যাণের ধারণার অনুসারী হয়ে থাকে। আর তা হচ্ছে হিউম্যান রাইটস। ফলে বলা যায়, প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ভূমিকা কিংবা মানদণ্ড হলো হিউম্যানিজম। এটাকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে। সাংবিধানিক ক্ষমতার প্রধান দায়িত্ব হলো হিউম্যান রাইটসকে রক্ষণাবেক্ষণ করা।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাস্তবতাকে অনুধাবন করার জন্য General Will এবং Will of All এর মধ্যকার পার্থক্য বুঝা অনেক জরুরি।[১০১] General will এর অর্থ হলো স্বাধীনতা ও সমতার বৃদ্ধিকে রাষ্ট্রের একমাত্র মূলনীতি এবং উদ্দেশ্য মনে করা। আর হিউম্যান রাইটস এই জেনারেল উইলকেই স্বীকৃতি দেয়। অন্যভাবে বললে, জেনারেল উইলের মানে হলো অধিকাংশের কী চাওয়া উচিত, তা।[১০২] পক্ষান্তরে উইল অফ অল-এর অর্থ হলো কোনো সমাজের সিটিজেনদের খায়েশ ও প্রবৃত্তির সমষ্টি, যাদের অধিকার আছে স্বাধীনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করার। কিন্তু তাদের এই অধিকার নেই যে, তারা স্বাধীনতা বৃদ্ধি ছাড়া কোনো উদ্দেশ্য কিংবা হিউম্যানিজম বিরোধী কোনো নীতি গ্রহণ করবে। সংক্ষেপে বললে, উইল অফ অল সর্বদা জেনারেল উইলের অধীনেই থাকবে। উইল অফ অল একমাত্র স্বাধীনতা সমতা উন্নতিই হবে। এটাই জেনারেল উইল। যদি উইল অফ অল জেনারেল উইলের পরিপন্থি হয়, তা হলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো এমন উইল অফ অল দমন করা এবং নিশ্চিহ্ন করে ফেলা।[১০৩]

কারণ, যদি উইল অফ অল হিউম্যানিজমের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তা হলে এর অর্থ দাঁড়ায় তারা এমন জিনিস চায়নি, যা তাদের চাওয়া উচিত ছিল। যখন অধিকাংশকে আইনপ্রণয়নের ক্ষমতাই প্রদান করে স্বয়ং হিউম্যানিজম, তখন তারা কীভাবে এই অধিকার ব্যবহার করে হিউম্যান রাইটসকে রহিত করতে পারে? সংবিধান সর্বদাই হিউম্যানকে হাকিমিয়্যাত প্রদানের ঘোষণা করে, যার ভিত্তি হলো সিটিজেন অথবা হিউম্যান ভালো-মন্দের যেই ব্যাখ্যা ইচ্ছা অবলম্বন করতে পারে। তবে শর্ত হলো সেই ব্যাখ্যা যেন কোনোভাবেই হিউম্যানিজমের বিরুদ্ধে না যায়। উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ তালেবানদের ভোট দিয়ে রাষ্ট্র-ক্ষমতায় নিয়ে আসে তবে এর মর্ম দাঁড়ায় তারা হিউম্যান রাইটস-এর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে। সুতরাং এমন উইল অফ অলকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করা হবে। কারণ এই উইল

---

[১০১] Jacques Rousseau এর লেখায় এই পার্থক্য পাওয়া যায়

[১০২] what should be the will of all

[১০৩] ইসলামি ব্যাংকারি আওর জমহুরিয়্যত- ২১১

অফ অল জেনারেল উইলের অনুগামী হয়নি। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই নব্বইয়ের দশকে আলজেরিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী ইসলামি দলের[১০৪] নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি। কারণ তারা স্বাধীনতার পরিবর্তে 'আবদিয়্যাত'কে বিশ্বাস করত।[১০৫] বাল্যপ্রেম ও ব্যভিচার অনুমোদন পাওয়া; অথচ উভয়পক্ষের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাল্যবিবাহ রোধ অভিযান এর সাম্প্রতিক উদাহরণ।

সুতরাং বুঝতে হবে, উদারনৈতিক (!) গণতান্ত্রিক কার্যক্রম মূলত হিউম্যানিজমকে প্রতিষ্ঠা করারই যন্ত্র। এটা দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা কিংবা ইসলামের কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়।

আমাদের একটি মারাত্মক ভুল হলো, পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানকে নিরপেক্ষ এবং অপ্রতিক্রিয়াশীল মনে করা। পাশ্চাত্যের সামাজিক বিজ্ঞান চরমভাবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। এই সামাজিক বিজ্ঞানের মৌলিক স্ট্রাকচারকে মেনে নিয়ে তার ভেতর ইসলামকে রিপ্লেস করতে চাইলে, তা নিশ্চিতভাবেই ইসলামকে ধ্বংস করে দেবে। প্রতিটি স্ট্রাকচার গড়ে ওঠে নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য। আর বাস্তবে হচ্ছেও তা। আমরা পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানের মূল স্ট্রাকচার মেনে নিয়ে যত যা-ই করি না কেন, শেষমেশ তার ফল ও পরিণতি আমাদেরই ভোগ করতে হচ্ছে। সর্বত্র ইসলামের প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে আর পাশ্চাত্যের প্রভাব গ্রাস করে নিচ্ছে।

সেক্যুলারিজম

পাশ্চাত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করার পর আলাদা করে সেক্যুলারিজমের ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি না। এখানে

---

[১০৪] ৯০-এর দশকে আলজেরিয়ায় গণতান্ত্রিক নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় ইসলামি স্যালভেশন ফ্রন্ট ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে যখন উপনীত হয় তখনি বুদিয়াফকে দিয়ে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে তাকে কঠোর ও নির্মমভাবে দমন করা হয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে গণতন্ত্র বা নির্বাচন বিষয় নয়; মূল বিষয় হচ্ছে ইসলামের উত্থান ঠেকানো। তাদের দেওয়া প্রক্রিয়া অবলম্বন করে কেউ আপাত-জয়ী হলেও তাকে তারা দমন করে দেবে। এর উদাহরণ অনেক। নিকট অতীতে মিশরের মুহাম্মাদ মুরসি রহ. এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

[১০৫] মিসরের ব্রাদারহুডও একই আচরণের শিকার।

একইসাথে সেক্যুলারিজমের দালিলিক এবং তাত্ত্বিক দিক নিয়ে কথা বলা হবে। দালিলিক দিক থেকে সেক্যুলারিজমের তাত্ত্বিক দিকটা বুঝা বেশি জরুরি এবং এটা বেশ শক্তিশালীও বটে। সেক্যুলারিজমকে দুইভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সংজ্ঞাগতভাবে এবং ফলগতভাবে। সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞাগত দিকটা তার ফলগত অবস্থানের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

সংজ্ঞাগতভাবে সেক্যুলারিজম হলো রাষ্ট্র সব ধর্ম ও মতের প্রতি নিরপেক্ষ থাকবে। রাষ্ট্র নিজে কোনো ধর্ম গ্রহণ করবে না। রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সংবিধান মোতাবেক চলবে আর ব্যক্তি তার মতো করে ধর্ম পালন করবে। রাষ্ট্রের কাজে ধর্মের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। উল্লিখিত সংজ্ঞার বিচারে সেক্যুলারিজমের আবার দুটি দিক বেরিয়ে আসে।

১। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা।

২। সব মতের প্রতি সমান ও নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করা।

এক. ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার অর্থ হলো ধর্মীয় নির্দেশনা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকা। ব্যক্তিগত জীবন কেবলই ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি ব্যক্তির জীবনাচারের পরিধি নিজ সত্তা পেরিয়ে সন্তান, বউ, মা-বাবা, ভাই-বোনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তখন তা আর ব্যক্তিগত জীবন থাকে না; সমষ্টিগত জীবন (public life) হয়ে যায়। এই সীমা অতিক্রম করলেই ব্যক্তির উপর হিউম্যান রাইটস-এর বিধান প্রয়োগ হওয়া শুরু করে। যার ফলে সে তার স্ত্রী-সন্তানদের বিষয়েও কোনো প্রকার হিউম্যানিজমবিরোধী হস্তক্ষেপ করার অধিকার হারিয়ে ফেলে। মোদ্দকথা, ব্যক্তিগত জীবন শুধুই 'আমি'র মাঝে সীমাবদ্ধ। 'আমি'-এর বাইরে গেলেই শুরু হয়ে যায় পাবলিক লাইফ। বুঝতেই পারছেন ধর্মকে এরা কোথায় নিক্ষেপ করতে চায়। বাস্তবতা হলো, সেক্যুলারিজম ব্যক্তি-জীবনকেও প্রভাবিত করে। কারণ, সেক্যুলারিজমের মূল সংঘর্ষ স্রষ্টা কিংবা ধর্ম অস্বীকার করা নয়। এটা গৌণ বিষয়। সেক্যুলারিজমের মূল উপাদান হলো আল্লাহ এবং দীনের প্রভাব ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করা। ধর্মীয় প্রভাব অস্বীকারের ব্যাপারটি জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রেই হতে পারে। মুসলিমদের অনেকেই নিজেদের প্রফেশনাল লাইফকে দীনের প্রভাব থেকে মুক্ত মনে করে। ফলে দেখা যায় কোনো কাজকে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সত্তাগতভাবে হারাম মনে করলেও পেশা হিসেবে বৈধ মনে করছে।

এটা মুসলিম জীবনে সেক্যুলারিজমেরই প্রভাব। অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্রিকেটারসহ অনেক হারাম ক্যারিয়ারিস্ট মুসলিম ব্যক্তি-জীবনে নামাজ-রোজা পালন করছে; কিন্তু পেশা হিসেবে সুস্পষ্ট হারাম কাজগুলো বৈধ মনে করছে। এমন আচরণ সেক্যুলারিজমেরই প্রভাব। আবার এই অস্বীকৃতি একান্ত ব্যক্তি-জীবনেও হতে পারে। ব্যক্তির চিন্তা ও মনন থেকে যদি আল্লাহর কর্তৃত্বের ধারণা হারিয়ে যায়, ধর্মের প্রভাব প্রত্যাখ্যাত হয় তবে তা সেক্যুলারিজমেরই অংশ। ধর্মীয় বিধানাবলিকে নিছক ওহির টেক্সট থেকে গ্রহণ না করে নিজস্ব আকল কিংবা বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে গ্রহণ করার মতো ব্যক্তিগত প্রবণতা ধর্মীয় কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করারই ভিন্ন চিত্র। এজন্য কেউ নিয়মিত কিছু ধর্মীয় আচার পালন করেও ধর্মীয় কর্তৃত্বের জায়গায় অস্বীকারকারী হতে পারে। মুসলিম সমাজে এমন লোকের অভাব নেই বর্তমানে। সুতরাং সেক্যুলারিজম কেবল রাষ্ট্র, অর্থনীতি এবং সমাজের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তি-জীবনে হস্তক্ষেপ করাও এর বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কেউ সেগুলোর অনুসরণ করতে পারবে না। এখন প্রশ্ন হলো, এভাবে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করার ব্যাপারে ইসলাম কী বলে? রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলমানরা কার কর্তৃত্ব মেনে নেবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়সহ সর্বত্র কার বিধান চলবে?

এই ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। ইসলাম এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ফলে ইসলাম তার অনুসারীদের সর্বত্রই তার কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার নির্দেশ দেয়। কোনো ক্ষেত্রে এর কর্তৃত্ব অস্বীকার করলে ইসলাম তাকে নিজ অনুসারীদের কাতারে জায়গা দেয় না।[১০৬] নবীগণের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল উলুহিয়্যাত, উবুদিয়্যাত।[১০৭] কারণ কাফেররা

---

[১০৬] সুরা বাকারা, আয়াত ৮৫

[১০৭] সুরা নাহলের ৩৬নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন, 'আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন রাসুল পাঠিয়েছি, এই নির্দেশ দিয়ে যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।'

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে নবী-রাসুলদের দাওয়াতের মূল আহ্বান ছিল তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ। তার মানে এই নয় যে তারা তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর অস্বীকৃতিকে মেনে নিতেন। অধিকাংশ মানুষ স্বভাবগতভাবেই স্রষ্টায় বিশ্বাসী; কিন্তু

আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, বিশ্বপরিচালনাকারী সত্তা হিসেবে স্বীকার করত;[১০৮] কিন্তু তাকে একমাত্র মাবুদ ও হাকিম হিসেবে মানত না। আল্লাহর উবুদিয়্যাত এবং হাকিমিয়্যাত অস্বীকার করত।[১০৯] আর সেক্যুলারিজমের মূল কাঠামোই 'আল্লাহর উবুদিয়্যাত এবং হাকিমিয়্যাত প্রত্যাখ্যান করা', যাকে মহান আল্লাহ জাহিলিয়্যাত বলেছেন।[১১০] আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে বাদ দিয়ে জাহিলিয়্যাত গ্রহণ করাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুফর এবং শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১১১]

হেদায়েত ও শ্রেষ্ঠত্বের সার্টিফিকেট গ্রহণকারী উম্মাহর মহান সালাফ ও পূর্ববর্তী ইমামগণ এবং বর্তমান আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, 'ফাসলুদ দীন আনিদ দাওলাহ আও আনিস সিয়াসাহ' তথা রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা সুস্পষ্ট কুফুর। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

> তারা কি জাহিলিয়্যাতের শাসনব্যবস্থা কামনা করে! বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য শাসন-পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে আছে?[১১২]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এমন ব্যক্তির নিন্দা করেছেন, যে আল্লাহর অকাট্য বিধান ছেড়ে দেয়; অথচ তা সকল কল্যাণ সমন্বিত করে, সকল ক্ষতিকারক বস্তু নিষিদ্ধ করে। আল্লাহর বিধান ছেড়ে দিয়ে সে ফিরে যায় এমন মতামত, রীতিনীতি ও প্রথার দিকে, যা প্রণয়ন করেছে মানুষ, আল্লাহর শরিয়তের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই, যেমনটা করত জাহেলি যুগের মানুষেরা। তারা তাদের চিন্তাপ্রসূত মত থেকে প্রণীত

আল্লাহর ইবাদতের জায়গায় এসে মানুষের ভ্রষ্টতা খুব বেশি প্রকাশ পায়। ফলে নবী-রাসুলদের দাওয়াতে আল্লাহর উবুদিয়্যাতের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

[১০৮] সুরা যুমার, আয়াত ৩৮

[১০৯] সুরা নিসা, আয়াত ৬০

[১১০] সুরা মায়িদা, আয়াত ৫০

[১১১] সুরা মায়িদা, আয়াত ৪৪

[১১২] সুরা মায়িদা, আয়াত ৫০

জাহেলি ভ্রান্ত বিধান দ্বারা ফয়সালা প্রদান করত। যেমন, তাতাররা তাদের সেসব রাষ্ট্রীয় আইনকানুন দিয়ে বিচার-ফয়সালা করেছে, যা তারা গ্রহণ করেছে তাদের বাদশাহ চেঙ্গিস খান থেকে। চেঙ্গিস খান তাদের জন্য 'ইয়াসিক' নামক সংবিধান প্রণয়ন করেছে। ইয়াসিক হলো ইসলামি, নাসরানি, ইহুদিসহ বিভিন্ন শরিয়তের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংবিধান। তাতে এমন অনেক বিধান আছে, যা সে শুধু নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা থেকেই গ্রহণ করেছে। তারপর তা তার অনুসারীদের নিকট পরিণত হয়েছে অনুসরণীয় সংবিধানরূপে। একে তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করার উপর অগ্রাধিকার দেয়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে কাফের। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব, যতক্ষণ সে আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিধানের দিকে ফিরে না আসে এবং কমবেশি যাই হোক, যেকোনো ব্যাপারে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কিছুকে ফয়সালাকারী হিসাবে গ্রহণ না করে।"[১১৩]

আল্লামা মুসতফা সাবারি[১১৪] রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করা আর দীনে ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ - এই দুই বিশ্বাস কখনো এক হতে পারে না।'[১১৫]

তিনি আরো বলেন, 'কোনো মুসলমান যদি তার সাধারণ সামাজিক জীবনে দীনের এই কর্তৃত্ব মেনে না নেয় যে, দীন তাকে আদেশ ও নিষেধ প্রদান করবে এবং তার কার্যাবলির মধ্যে দখল দেবে, তা হলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি কীভাবে খারিজ হবে না, যে রাষ্ট্রীয় জীবনে এই কর্তৃত্ব এবং এই দখলদারত্ব মেনে না নেবে!'[১১৬]

আল্লামা জাহেদ কাউসারি রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট কুফুর।[১১৭]

---

[১১৩] তাফসির ইবনে কাসির, ৩:১৩১

[১১৪] তুর্কি ইসলামি চিন্তাবিদ- (১৮৬৯-১৯৫৪)

[১১৫] মাওকিফুল আকল- ২৮০

[১১৬] মাওকিফুল আকল ৪:২৯৪

[১১৭] মাকালাতুল কাউসারি, হুকমু মুহাওয়ালাতি ফাসলিদ দীন: ৩৩০-৩৩১, প্রকাশনা: আল মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ

শাইখ সালেহ আল ফাওজান রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করার মতাদর্শ গ্রহণ করবে সে কাফের।[১১৮]

বাংলাদেশের উচ্চতর ইসলামি আইন ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা'র মুদির মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ তার এক বক্তব্যে ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কিছু নেই। ইসলামের ভিত্তি হলো আল্লাহর কালাম কুরআন মজিদ।

তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা সমার্থক। এবং এর সবচেয়ে হালকা ব্যাখ্যাদাতারও দাবি হলো, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না, যা স্পষ্টতই কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থি।[১১৯]

সংজ্ঞাগতভাবে সেক্যুলারিজমের দ্বিতীয় দিক হলো সকল মতের প্রতি উদার ও নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করা। ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যেকে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার যেই মাপকাঠি গ্রহণ করবে, তা মেনে নেওয়া। অন্যভাবে বললে, টলারেন্স[১২০]-এর উদ্দেশ্য হলো, ভিন্নমতকে শুধু মেনে নেওয়াই নয়; বরং ভালো-মন্দের ধারণাগুলোর ভিন্নতাকে গুরুত্বহীন এবং অনর্থক মনে করা। স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতিকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করার দাবি হলো, কেউ নিজের কল্যাণের ধারণার ভিত্তিতে অন্যকারো সমালোচনা করার কিংবা পরিবর্তন করার অধিকার রাখে না। এমনকি একজন পিতা তার সন্তানকেও নামাজ পড়ার জন্য জোরজবরদস্তি করতে পারবে না। জীবনপরিচালনার প্রতিটি পদ্ধতি সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমানভাবে মেনে নেওয়ার নাম টলারেন্স। যখন প্রত্যেকের ব্যক্তিগত খায়েশ পূরণ এবং জীবনপরিচালনার সমস্ত পদ্ধতি ও ধারণা সমান মর্যাদার, তখন প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক হলো অন্যের খায়েশ ও প্রবৃত্তি মেনে নেওয়া এবং তাকে সম্মান করা।

---

[১১৮] https://islamqa.info/amp/ar/answers/121550

[১১৯] (ধর্মনিরপেক্ষতা, সংবিধান ও ইসলাম; মাসিক আলকাউসার, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪) এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে 'তাওহিদুল হাকিমিয়্যাহ' বইটি পড়া যেতে পারে।

[১২০] টলারেন্সের শাব্দিক অর্থ সহ্য করা বা সহিষ্ণুতা; কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো সকল মতের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও নিরপেক্ষ অবস্থান লালন করা। যদিও তা হয় কুফর, ফিসক, জুলম বা অজাচার।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ

ইসলামের দৃষ্টিতে টলারেন্সের নীতি গ্রহণ করার অর্থ হলো- ইসলাম ঘোষিত 'আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার' প্রত্যাখ্যান করা। কারণ যখন ভালো-মন্দ নির্ধারণ করাকে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা হিসেবে মেনে নেওয়া হবে এবং কল্যাণের সমস্ত ধারণা সমান চোখে দেখা হবে, তখন মন্দের অস্তিত্ব অস্বীকার করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে। যে যার মতো করে ভালো-মন্দের সংজ্ঞা বানিয়ে নেবে আর সবাইকে অপরের এই ধারণার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এই অবস্থাতে পৃথিবীতে মন্দ বলে কিছু থাকছে না। ফলে নাহি আনিল মুনকারের প্রশ্নই আসছে না।

এই অবস্থাতে যদি ইসলামের নির্দিষ্ট কল্যাণের ধারণার ভিত্তিতে আমাদের কাছে কোনো মন্দাচার ধরা পড়ে, তা হলে তা মেনে নিতে হবে। তাকে প্রতিহত করার কোনো চিন্তাভাবনা এবং চেষ্টাপ্রচেষ্টা চালানো যাবে না। পশ্চিমা আকিদার দাবি হলো, অন্যের প্রতিটি কাজ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। মোটকথা, টলারেন্সের দৃষ্টিভঙ্গি কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত 'নাহি আনিল মুনকার' সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক। স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতিকে পৃথক মূলনীতি হিসেবে মেনে নেওয়ার অর্থ হলো, ইসলামও কল্যাণের সমস্ত ধারণা এবং মাপকাঠিকে সমান মনে করে। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ কোনো জীবনব্যবস্থা নয় এবং ইসলাম একমাত্র কল্যাণ নয়; বরং ইসলাম একটি ব্যাপক জীবনব্যবস্থার অংশমাত্র, যেখানে কল্যাণের সমস্ত ধারণা ও মাপকাঠি সমান আর সেই ব্যবস্থার নাম হলো লিবারেলিজম।

এমন দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয়। কারণ, দুনিয়ার সকল মত ও পথের জন্য শান্তিপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ স্বাধীন পরিবেশ নিশ্চিত করা ইসলামের উদ্দেশ্য নয় (সেক্যুলারিজমেরও না)। ইসলাম শুধু কিছু বিশ্বাস এবং নৈতিকতার নাম নয় যে প্রতিটি জীবনব্যবস্থার সাথে ইসলামকে মেলানো যাবে; বরং ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যার মাঝে আকিদা ও নৈতিকতার পাশাপাশি ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি অবস্থা বা কাজের বিধান রয়েছে। ইসলাম কখনোই অনেকগুলো কল্যাণের ধারণার মধ্য থেকে একটির দাবি করে না। বরং ইসলাম নিজেকে একমাত্র সত্য ও কল্যাণ হিসেবে ঘোষণা করে।[১২১]

---

[১২১] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯, ৮৫; সুরা আনআম, আয়াত ১৫৩

সুতরাং ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে টলারেন্স এবং plurality (বহুত্ববাদ) এর কথা বলাই একটি অনর্থক বিষয়। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী ব্যক্তি হক ও বাতিল চিহ্নিত হওয়ার পর এই দুটো বিষয়কে সমমর্যাদা ও অধিকার দিতে পারে না। উভয়টির জন্য সমান পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে না। এটা মারাত্মক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হবে। ইসলাম tolerance এবং plurality of goods এর নীতিকে ধারণ করে- এমন দাবি হাস্যকর। যখন ইসলাম দাবি করছে ইসলামই একমাত্র হক এবং মুক্তি ও সফলতার অদ্বিতীয় পথ; অন্যান্য সব জাহান্নাম ও ধ্বংসের রাস্তা তখন ইসলাম ছাড়া সব বাতিল শক্তি প্রতিপালন করা এবং লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিয়ে তাদের উন্নতির সর্বপ্রকার সহজ ব্যবস্থা করে দেওয়া মূলত ইসলামের উক্ত দাবির বিরোধিতা করা। যদি কেউ বাস্তবেই ইসলামকে একমাত্র সত্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় তা হলে তাকে এটাও মানতে হবে যে, ইসলাম পৃথিবীতে নিজস্ব জীবনব্যবস্থার বাইরে অন্যান্য জীবনব্যবস্থাকে পরাজিত করবে। একটি জীবনব্যবস্থাকে বাতিল মানা হবে আবার তার বিজয়কে বরদাশত করা হবে- এটা হাস্যকর ব্যাপার। একজন নির্বোধ মানুষই এমনটা মনে করতে পারে। কোনো জিনিসকে মন্দ হিসেবে চিহ্নিত করার পর পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে তাকে বিস্তার করার অধিকার দেওয়া আত্মঘাতী ও বোকামি সিদ্ধান্ত ছাড়া কী হতে পারে?

ইসলামের নিজেকে একমাত্র সত্য হিসেবে ঘোষণা করা এবং সর্বশক্তি-যোগে এর প্রতি আহ্বান করার আবশ্যকতা হলো, ইসলাম অন্য সব ব্যবস্থাকে মিটিয়ে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার দাবি জানাবে এবং এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তার অনুসারীদের জানমাল উৎসর্গ করার নির্দেশ দেবে। কাফেররা আমাদের এই প্রচেষ্টা সহ্য করবে কি না এবং অমুসলিমদের সাহায্য আমরা পাব কি না- এখানে এসব প্রশ্নের কোনো তাৎপর্য নেই।[১২২]

ইসলামের এমন মৌলিক অবস্থার স্বাভাবিক ফল হলো, প্রকৃত মুসলিমের অস্তিত্বই কুফুরি রাজত্বের জন্য হুমকি হয়ে থাকবে। কারণ, কেউ মেনে নিক বা না নিক, সর্বাবস্থায় নিজের অনুসারীদের প্রতি ইসলামের দাবি হলো, যেখানে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত নেই, সেখানে সে তার হাকিমিয়্যাত প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম করবে।

---

[১২২] সুরা তাওবা, আয়াত ৩২; সুরা সফ, আয়াত ৮

নিঃসন্দেহে ইসলামে শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও নিরাপত্তা তা-ই, যা শরিয়ত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্জিত হয়। মূলত শান্তি ও নিরাপত্তার ইউনিভার্সাল কোনো কনসেপশন নেই। প্রতিটি জীবনব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট কনসেপ্টের শান্তি ও নিরাপত্তার দাবি করে। এর কারণ হলো অধিকারের ব্যাখ্যার ভিন্নতা। শান্তি কিংবা নিরাপত্তার মানে হলো, কোনো জীবনব্যবস্থা ব্যক্তির জন্য যেসব অধিকারের স্বীকৃতি দেয়, তা সংরক্ষণ করা। যেমন, ইসলাম সমকামিতাকে ব্যক্তির অধিকার মনে করে না, তাই ব্যক্তিকে এই কর্মের অনুমোদনও দেয় না। এই কাজে তার জন্য ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করে না। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ সমকামিতাকে ব্যক্তির অধিকার মনে করে, তাই এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা দাবি করে এই সভ্যতা। পাশ্চাত্যের শান্তির কনসেপ্ট বুঝার জন্য নোবেল পুরস্কার আমাদের সামনে এক স্পষ্ট উদাহরণ। এই পর্যন্ত তাদেরকেই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, যারা কোনো না কোনোভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করেছে কিংবা পাশ্চাত্যের চিন্তা ও দর্শনের উপকার করেছে। এজন্য কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ নয়, সে কাফেরদের এই পুরস্কার নিয়ে গর্ব করবে, ফ্যান্টাসিতে ভুগবে এবং একে ভালো চোখে দেখবে।

এই মৌলিক পার্থক্য না বুঝার কারণে অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ শান্তি ও নিরাপত্তাকে ইউনিভার্সাল মনে করে। এর সবচেয়ে বাজে দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই মাকাসিদে শরিয়াহর অধ্যায়ে। ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তির উদ্দেশ্য কেবল জান-মালের নিরাপত্তা নয়। একজন ব্যক্তি তার সন্তানকে জিনা থেকে, পাপাচার থেকে, সমাজে প্রচলিত নানা অপরাধ থেকে বাঁচাতে পারছে কি না ইসলামে এটাও নিরাপত্তার অংশ। ইসলামি শরিয়ত ছাড়া অন্য কিছুর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শান্তি ধর্তব্য নয়। কারণ শান্তি ও নিরাপত্তার প্রকৃত অর্থ হলো, শরিয়তপ্রদত্ত অধিকারসমূহের সংরক্ষণ করা। শরিয়তের বাইরে অধিকারের অন্য কোনো ব্যাখ্যার সংরক্ষণ করা মানে জমিনে ফ্যাসাদ ও জুলুম প্রতিষ্ঠা করা। শরয়ি অধিকারসমূহের সংরক্ষণ একমাত্র ইসলামি ইমারাহ-ই করতে পারে। এজন্য শান্তি ও নিরাপত্তা তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন কুফুরি (তাগুতি) ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে ইসলামি শাসন চালু হবে। এ ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

কেউ যদি ইসলামে শান্তি ও নিরাপত্তার এই অর্থ বোঝে যে তাগুতি এবং শয়তানি শাসন-ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করবে এবং মুসলমানদের উপর কোনো আঘাত আসবে না তা হলে সে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিই বুঝতে পারেনি। কুফর ও তাগুতের প্রতিষ্ঠিত নিরাপত্তা আদতে কোনো নিরাপত্তাই নয়; নিছক ধোঁকা। কুরআন বলছে,

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

> ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা কখনোই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।[১২৩]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

لَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا

> বস্তুত তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদেরকে দীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি সম্ভব হয়।[১২৪]

সুতরাং ইসলামকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিরাপত্তাই ইসলাম কামনা করে। এর মাঝেই ইসলাম মানুষের প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা দেখে। কুফুরি ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত নিরাপত্তার উদ্দেশ্য হলো, পুরো মানবজাতি স্বস্তির সাথে জাহান্নামের পথে চলার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে। শান্তি প্রতিষ্ঠার এমন ধারণা মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বের সাথেই সাংঘর্ষিক। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

> বিশ্ব সমাজে তোমরা মুসলমানরাই শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছ। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর, অসৎকাজে বাধা দাও এবং আল্লাহর উপর ঈমান আন।[১২৫]

---

[১২৩] সুরা বাকারা, আয়াত ১২০

[১২৪] সুরা বাকারা, আয়াত ২১৭

[১২৫] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০

হাদিস শরিফে আছে, 'তোমাদের কেউ মন্দ কিছু দেখতে পেলে তা যেন হাত দিয়ে দমন করে, হাতে না পারলে মুখে দমনের কথা বলবে। এটাও না পারলে অন্তর দিয়ে দমন করার প্লান-প্রোগ্রাম সাজাবে।'[১২৬]

অন্য বর্ণনায় আছে, 'আমার পূর্বে যত নবী প্রেরণ করা হয়েছে, তাদের সকলেরই এমন কিছু সাথি-সহযোগী ছিল, যারা নবীদের সুন্নত আঁকড়ে ধরত এবং তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলত। অতঃপর এমন অযোগ্য উত্তরসূরি আসত, তারা যা বলত নিজেরা তা করত না এবং সেই কাজই করত, যা তাদের করতে বলা হয়নি। এমন লোকেদের সাথে যে হাত দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন, যে জবানের সাহায্যে জিহাদ করবে সেও মুমিন, যে অন্তর দিয়ে জিহাদ করবে সেও মুমিন। কিন্তু এর পরবর্তী স্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না।'[১২৭]

উল্লিখিত হাদিসগুলোতে সুস্পষ্টভাবেই সেসব লোকের ঈমান নাকচ করা হয়েছে, যারা অন্তর দ্বারা মন্দকে মন্দ মনে করে না। মন্দ কাজ সংঘটিত হতে দেখে ব্যথিত হয় না এবং তাকে নিঃশেষ করার জন্য কোনো সংকল্পও করে না। ভালো কাজে প্রশান্তি লাভ এবং মন্দ কাজে ব্যথিত হওয়াকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের আলামত বলেছেন। টলারেন্সের দর্শন মূলত ঈমানের সাথেই সাংঘর্ষিক। কারণ এর সোজা কথা হলো মন্দ বলতে কিছু নেই।

টলারেন্সের ইসলামিকরণ

কুরআনুল কারিমের বহুল ব্যবহৃত একটি আয়াত-

لَآ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِ

দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।[১২৮]

কুরআনের এই আয়াত ব্যবহার করে অনেকে টলারেন্সের দর্শনকে ইসলামি দর্শন প্রমাণ করতে চায়। ব্যাপক অর্থে তারা বুঝাতে চায় যে দীনের যেকোনো ব্যাপারে জোরজবরদস্তি করা নিষেধ। এটা সম্পূর্ণ ভুল

---

[১২৬] সহিহ মুসলিম- ১৭৭

[১২৭] সহিহ মুসলিম- ১৭৯

[১২৮] সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৬

ব্যাখ্যা। কারণ এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের সকল বিধান অনর্থক হয়ে পড়ে। এখন যদি দুজন নারী পুরুষ মিলেমিশে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়ায় এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তা হলে ইসলাম তাদের উপর হদ প্রয়োগ করতে পারে না। কারণ এটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এভাবে সমষ্টিগত জীবনের প্রতিটি বিধানই অকার্যকর হয়ে যাবে; যদি আয়াতের এমন ব্যাপক অর্থ নেওয়া হয়। তা ছাড়া কোনো মুফাসসির আয়াতটির এমন তাফসির করেননি। আয়াতের অর্থ হলো, কোনো মানুষের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করানোর ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। এই ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি অর্থহীন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাদের উপর ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যাবে না। বরং যার জন্য যেই বিধান ও বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য, তা তার উপর যথাযথভাবে প্রয়োগ হবে।

মূলত ইসলামে সব ধরনের জবরদস্তি নিষিদ্ধ নয়। বরং যেই জবরদস্তি শরিয়তে নেই, তাকেই কেবল ইসলাম নাকচ করে। আল্লামা শাতেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আয়াতটি অবতীর্ণ করা হয়েছে সেই ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য, যে শরিয়তবহির্ভূত পন্থায় জবরদস্তি করে। যেমন, কেউ কোনো পুরুষকে চাপ দিল তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে (এটা নিষিদ্ধ)। তবে যখন শরিয়তের নির্দেশিত পন্থায় জবরদস্তি করা হবে তা অবশ্যই গ্রাহ্য হবে। যেমন, কোনো কাফের তরবারির ছায়ায় ইসলাম কবুল করল।[১১৯]

সুতরাং ইসলামে নিরপেক্ষতা এবং সমান অধিকার বলতে কিছু নেই। বরং ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করে। শরিয়তপ্রদত্ত অধিকারকেই বাস্তবায়িত করে। ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম। এটাই ইসলামের পরিচয়। শান্তি, নিরাপত্তা, সমতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি দিয়ে ইসলামকে জাস্টিফাই করার অধিকার কারো নেই। কারণ ইসলাম এগুলোর দাবি করে না। ইসলামে নিরপেক্ষতা কিংবা সমতা থাকলে ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি কুফর প্রচারেরও অনুমোদন থাকত। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্র কখনোই কুফর প্রচারের অনুমতি দেয় না। সম্পূর্ণরূপে কুফরের প্রচার-

---

[১১৯] আল ই'তিসাম- ৩৭০

প্রসার নিষিদ্ধ করে। জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমে আহলে কুফুর কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়ে ধর্মীয় কার্যকলাপ পালন করতে পারে। তবে তাও মুসলিমদের অধীনস্থ হয়ে এবং অত্যন্ত গোপনে।

ইসলামে নিরপেক্ষতা থাকলে একজন অমুসলিমও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার লাভ করত। কিন্তু ইসলাম কোনো অমুসলিমকে সেই অধিকার দেয়নি। এটাই ন্যায্য বিধান।

ইসলামি রাষ্ট্রে চুক্তি ও জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমে যারা জিম্মি হবে, তাদেরকে ইসলাম নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার দিয়েছে। তবে ব্যাপারটা এতো ব্যাপক না এবং ইসলামের মতো সমান অধিকারও না সেটা। নির্দিষ্ট কিছু শর্ত ও সীমাবদ্ধতা জারি করার মাধ্যমে তারা নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় সুবিধা পাবে। এখনকার মতো অলিগলিতে শিরক ও কুফুরের জৌলুস, পরিবেশ ভারি-করা আয়োজন, নির্লজ্জ ও অশ্লীল মহড়া এবং শক্তিমত্তা প্রদর্শনের অনুমোদন তারা পাবে না। এগুলো ইসলামসমর্থিত অধিকার নয়। জিম্মিদের বিধান নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই। ফিকহের প্রতিটি গ্রন্থে উম্মতের ফকিহগণ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। মোটাদাগে ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের জন্য বিধিবদ্ধ নিয়ম হলো,

১। জিজিয়া প্রদান ব্যতীত ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসের অধিকার পাবে না।

২। নতুন কোনো উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারবে না (যদি রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি থাকে তবে ভিন্ন কথা)।

৩। নিজেদের ধর্মের প্রচার চালাতে পারবে না মুসলিমদের মাঝে।

৪। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে তারা নিয়োগ পাবে না।[১০০]

এই ধরনের কিছু বিধিবদ্ধ আইন রয়েছে, যেগুলো সামনে রাখলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের বর্তমান সেক্যুলার অধিকার ইসলাম দেয় না। ইসলাম তাদের যতটুকু অধিকার দেয়, তাই ন্যায্য। আমরা মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে আজকাল এসব বিষয় কাটছাঁট করে থাকি।

---

[১০০] বিস্তারিত জানতে দেখুন : আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ইবনুল কাইয়িম আল জাওজি রহিমাহুল্লাহ।

এই ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করা বড় ফ্যাক্ট হয়ে দাঁড়ায়; অথচ ইসলামের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য কাটছাঁট না করে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরাই অধিক ফলপ্রসূ। মানুষের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করানো আমাদের দায়িত্ব না। আল্লাহ এই ক্ষমতা কোনো মানুষকেই দেননি। ফলে এমন কাটছাঁটের বিশেষ কোনো ফায়দা নেই। এতে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হচ্ছে- আমরা মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে ফেলছি। আমরা ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ করলে আল্লাহ যাকে হেদায়েত দিতে চান তার কাছে এটাই সত্য ও ইনসাফ মনে হবে। আর যাকে চান না তার কাছে গোঁড়ামি, বাড়াবাড়ি ইত্যাদি মনে হতে পারে। কিন্তু তার এই ধারণা দূর করার জন্য কাটছাঁটের অনুমোদন দেওয়া হয়নি। বরং আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আপসহীনভাবে ইসলাম যা বলেছে, তা পালন করে যাওয়া।

আমরা নিজেদের শরিয়ত নিয়ে এক ধরনের হীনম্মন্যতায় ভুগি। আমরাই নিজেদের শরিয়তকে একরকম উগ্রতা, গোঁড়ামি ও বেইনসাফি মনে করি। তা না হলে তো এসব বিধানের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের সাথে আপসের নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়ত না। আল্লাহ যে অধিকার অবস্থাভেদে মানুষকে দিয়েছেন, তা আসলেই ন্যায্য কি না- এ ব্যাপারে আমরা দ্বিধা-সংশয়ে ভুগি। আমরা কোনোপ্রকার তোষামোদি ছাড়া বলতে পারি না এটাই ন্যায় ও সত্য। এর একমাত্র কারণ আমরা পাশ্চাত্যের মানদণ্ড মেনে নিয়েছি। অথচ একটা সেক্যুলার রাষ্ট্রে কোনো অ-সেক্যুলার বেঁচে থাকার অধিকার পায় না। যেখানে সেক্যুলারিজম অ-সেক্যুলার নাগরিকদের উপর হত্যা কিংবা বন্দির বিধান প্রয়োগ করতে কোনো কপটতার আশ্রয় নেয় না, সেখানে কীভাবে আমরা নিজেদের শরিয়তের ব্যাপারে এমন কপটতার আশ্রয় নিতে পারি; অথচ আমাদের শরিয়ত এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি সবকিছুর মালিক, সেক্যুলাররাও যার সৃষ্টি? স্রষ্টার সাথে বিদ্রোহ করার ব্যাপারে তারা এতটা আপসহীন হতে পারে আর আমরা রবের দাসত্বে আপসহীন হতে পারছি না!

ইতোপূর্বে সেক্যুলারিজমের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে, পরিণামের দিক থেকে সংজ্ঞাটা প্রতারণা ছাড়া কিছুই না। কারণ প্রকৃতপক্ষে

সেক্যুলারিজম যদিও রাষ্ট্র থেকে আসমানি ধর্মকে পৃথক করে তবে ব্যক্তিগত বিষয় বলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সে আত্মপূজারি আরেকটি ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে। আরো স্পষ্ট করে বললে সেক্যুলারিজম নিজেই একটি ধর্ম। এই ধর্মের শরিয়ত কিংবা সাংবিধানিক মাপকাঠি হলো হিউম্যানিজম। এই ধর্মের প্রভু হলো মানুষ এবং জ্ঞানের উৎস হলো আকল। সেক্যুলারিজম নিজেই একটি ধর্মীয় অথরিটি সংরক্ষণ করে। সে অন্যান্য ধর্মের উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সকল ধর্মীয় অনুশাসনকে সে নিজস্ব মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করে। সে যদিও মুখে বলে যে সব ধর্ম তার স্বাধীনতা পাবে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সেক্যুলারিজম একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে তার ধর্মে ঘোষিত হালাল গ্রহণ করতে এবং হারাম বর্জন করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তার নিজস্ব হালাল-হারাম তথা বৈধতা-অবৈধতার ধারণা রয়েছে। সেই ধারণার ভিত্তিতেই সে প্রতিটি বিষয়ের অনুমোদন দিয়ে থাকে। তার নিজস্ব বৈধতার ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক যেকোনো বিষয় সে বেআইনি এবং বাতিল করে দিতে পারে। মোটকথা, একটি ধর্মের ফুল কনসেপ্ট সেক্যুলারিজমে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বলতে হবে, সেক্যুলারিজম কখনোই ধর্মনিরপেক্ষতা নয়; বরং সে নিজেই একটি ধর্ম।

তবে চিন্তার বিষয় হলো, সেক্যুলারিজম সকল ধর্ম সরিয়ে একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও কেবল ইসলামের সাথেই কেন সূচনালগ্ন থেকে এর সামগ্রিক সংঘর্ষ চলে আসছে এবং ইসলামের উপরই কেন তার আঘাতটা বেশি পড়ছে? এর প্রধান কারণ তো তা-ই, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ১৪শ বছর আগে। وَالْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ অর্থাৎ ইসলামের বিরুদ্ধে সমস্ত কুফরিশক্তি একজোট।[১৩১] তবে এর অন্তর্নিহিত কারণটা দৃষ্টিভঙ্গিজনিত এবং আদর্শিক। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম মূলত কিছু বিশ্বাস আর আচার-অনুষ্ঠানের নাম। জীবনের সামগ্রিক নির্দেশনা সেসব ধর্মে নেই। ব্যক্তিগত কিছু দৃষ্টিভঙ্গির মাঝেই সেই ধর্মগুলো সীমাবদ্ধ। ব্যাপকভাবে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিধানশূন্য। ফলে সেই শূন্যস্থান কোনোপ্রকার সংঘর্ষ ছাড়াই পাশ্চাত্য সভ্যতা পূরণ করে নিয়েছে।

---

[১৩১] মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, হাদিস নং- ৭২৮

পক্ষান্তরে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ইসলামের দিকনির্দেশনা রয়েছে। এখানে শূন্যস্থান বলতে কিছু নেই। যার দরুন পাশ্চাত্য সভ্যতার কোনো কিছু এখানে অনুপ্রবেশ করতে হলে শূন্যস্থান তৈরি করে নিতে হবে। আর কোনো ভরাট জায়গায় শূন্যস্থান তৈরি করতে গেলেই সংঘর্ষ, মারামারি ও কাটাকাটির ব্যাপার চলে আসে। কোপটা তাই ইসলামের উপরই বেশি পড়ে। তা ছাড়া পাশ্চাত্যের প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গির সাথেই ইসলামের ঐতিহাসিক এবং আদর্শিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। পাশ্চাত্যের ইতিহাসের আলোচনায় বিষয়টি সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সেক্যুলারিজম যেমন ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে না, তেমনিভাবে সব ধর্ম ও মতবাদের প্রতি সে নিরপেক্ষও থাকে না। কারণ সেক্যুলারিজমের নিজস্ব আইনি কিংবা সাংবিধানিক কাঠামো আছে। আছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে আলাদা ধারণা। সেক্যুলারিজম তার নিজস্ব মাপকাঠি অনুযায়ী বিচার করে দেখবে কোন বিষয়টা তার সাথে সাংঘর্ষিক কিংবা তার উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। এমন যেকোনো বিষয় সে দমন করবে এবং নিষিদ্ধ করবে। এই অর্থে সে কখনোই নিরপেক্ষ কিংবা টলারেন্ট হতে পারে না। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে তো নয়ই, ব্যক্তিগত পর্যায়েও সেক্যুলারিজম অনেক সময় নিরপেক্ষ নয়। এজন্য দেখা যায় হিজাব, বিয়ে, দাড়ির মতো ব্যক্তিগত ইসলামি বিধানগুলোও সেক্যুলার রাষ্ট্রে নানাভাবে আইনি জটিলতার শিকার হচ্ছে। এসব ঘটনা অহরহ ঘটছে। বিষয়টি এখন সবার কাছেই স্পষ্ট। কারণ, এগুলো তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় খারাপ প্রভাব ফেলে। এখানে এসে জেনারেল উইল এবং উইল অফ অলের পার্থক্য বুঝার গুরুত্ব ধরা পড়ে।

মূলত পৃথিবীতে নিরপেক্ষতা (no position) বলতে কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেকেই যেকোনো একটা মাপকাঠির অধীনে সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকে। এই অর্থে যারা নিজেদের নিরপেক্ষ দাবি করে, তারা যেন সমস্ত উসুল থেকে বেরিয়ে শূন্যে অবস্থান করছে। এটা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই না। দুনিয়ায় এমন কোনো অবস্থান নেই, যা নিরপেক্ষ হতে পারে। উদাহরণত কেউ বলল, 'আমি অমুক বিষয়ে মুসলিম না হয়ে নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে চিন্তা করব।' এমন মন্তব্য চূড়ান্ত পর্যায়ের

নির্বুদ্ধিতা। ইসলামের অবস্থান থেকে সরে গিয়ে সে তো কুফুরি অবস্থান গ্রহণ করছে। সেটা আবার নিরপেক্ষ হয় কীভাবে! ইসলামের বাইরে যাওয়ার অর্থই হলো কুফুরি গ্রহণ করা। আর কুফর স্বয়ং একপাক্ষিক অবস্থান। ঈমান ও কুফুরের মাঝামাঝি কোনো অবস্থান নেই। ইমামগণ বহু আগেই এই অবস্থান নাকচ করে গেছেন।[১৩২]

'আবদিয়্যাত' থেকে বেরিয়ে মানুষ কখনো নিরপেক্ষ হয় না। বরং সে খায়েশ এবং শয়তানের গোলাম হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

فَاِنۡ لَّمۡ یَسۡتَجِیۡبُوۡا لَکَ فَاعۡلَمۡ اَنَّمَا یَتَّبِعُوۡنَ اَهۡوَآءَهُمۡ ؕ وَمَنۡ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَیۡرِ هُدًی مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهۡدِی الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِیۡنَ

> অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।[১৩৩]

সুতরাং ইসলামে যেমন কোনো নিরপেক্ষতা নেই তেমন সেক্যুলারিজমেও কোনো নিরপেক্ষতা নেই। হয়তো ইসলাম নয়তো কুফর। কোনো মুসলমান সেক্যুলারিজমকে গ্রহণ করতে পারে না। ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, একটি ইসলামি রাষ্ট্রে সব মতের লোক সমান অধিকার পায় না, কোনো কাফের মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা রাষ্ট্রীয় কোনো পদ লাভ করতে পারে না। সেক্যুলারিজমও এর ব্যতিক্রম নয়। কার্যত কোনো মুসলিম সেক্যুলার রাষ্ট্রের পদ গ্রহণ করতে পারে না। এর জন্য তাকে সেক্যুলার হতে হয়। কুরআন-সুন্নাহর উপর সেক্যুলার সংবিধানকে প্রাধান্য দিতে হয় তাকে। এই শপথ না করে সে কোনো পদ লাভ করতে পারবে না। সেক্যুলার শাসন-ব্যবস্থা তার সেক্যুলারিজম নামক ধর্মে বিশ্বাসী নাগরিকদের বাইরে অন্য নাগরিকদের সমান অধিকার দেওয়া তো

---

[১৩২] মাকালাতে তাফহিমে মাগরিব- ১০৬

[১৩৩] সুরা কাসাস, আয়াত ৫০

দূরের কথা, তার বসবাসের অধিকারই মেনে নেয় না। হয়তো তাকে হত্যা করে কিংবা বন্দি করে।[১৩৪] সুতরাং সেক্যুলারিজম কখনোই নিরপেক্ষ হতে পারে না। তা কখনো সব মত ও পন্থাকে সম-অধিকারও প্রদান করে না। সুতরাং মুসলিমদের জন্য সেক্যুলারিজম কখনোই কোনো সমাধান হতে পারে না; যেহেতু এটা প্রথমেই আল্লাহর আইনকে প্রত্যাখ্যান করে।

আমাদের উল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা যায় সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞাগত দিক হোক কিংবা ফলগত, কোনো দিকই ইসলামসম্মত নয়। শরিয়ত উভয় দিকই প্রত্যাখ্যান করে।

সেক্যুলারিজমের ইসলামিকরণ

সেক্যুলারিজমকে যারা ধর্মীয় পোশাক পরাতে চায়, তারা তাদের এই জঘন্য কর্মের পেছনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকে মদিনা সনদকে। 'মদিনা সনদ'কে সামনে রেখে তারা মানুষকে দেখাতে চায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ)। যে রাসুলকে প্রেরণই করা হয়েছে ইসলামকে সমস্ত ধর্ম, মতবাদ ও ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করে সকল বাতিল ও ভ্রান্ত চিন্তাধারা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য, তার ব্যাপারে এমন দাবি করা যে জঘন্য অপবাদ-তা একজন চিন্তাশীল সাধারণ মুসলিমেরও বুঝে আসার কথা। উপর্যুক্ত দাবি এতটাই অনর্থক যে, এটাকে খণ্ডন করা কেবল সময় নষ্ট করা হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের এতটাই অধঃপতন হয়েছে যে, বর্তমান বাস্তবতায় মুসলমানরা উপর্যুক্ত দাবিকেই বিশ্বাস করে নিচ্ছে। তাই কালের বিবর্তনে সেই সময় নষ্ট-করা কাজটিই জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এখানে একেবারে সংক্ষেপে মদিনা সনদের ব্যাপারে কিছু পয়েন্ট তুলে ধরব।

এক. ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সালাফদের কেউই ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে মদিনা সনদের টার্ম ব্যবহার করেননি এবং কেউই মদিনা সনদকে ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি সাব্যস্ত করেননি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১৩৪] কিন্তু ইসলাম ভিন্ন মতাদর্শের লোকদের বেঁচে থাকার অধিকার প্রদান করে।

ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে সাহাবিদের যুগ পেরিয়ে ইমাম-সালাফদের কারো কাছ থেকেই এটা প্রমাণিত নয়।

দুই. মদিনা সনদ কেবল একটি প্রতিরক্ষামূলক অঙ্গীকারনামা, যার উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক অবস্থায় শত্রু না বাড়িয়ে বরং এক শত্রুর বিরুদ্ধে আরেক শত্রুকে ব্যবহার করা। আর কোনো অঙ্গীকারনামা কখনোই মৌলিক ভিত্তি হতে পারে না। কারণ অঙ্গীকারনামা অস্তিত্বে আসেই একটা সাময়িক এবং আপাত-পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে, যা চূড়ান্ত কিছু হয় না। যেমন হুদায়বিয়ার চুক্তির কথাই ধরা যাক। সেখানে চুক্তির একটি বিষয় ছিল কোনো কাফের মুসলমান হয়ে রাসুলের কাছে চলে এলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। এটা ছিল সাময়িক সিদ্ধান্ত। মৌলিকভাবে ইসলাম কখনোই এটা সমর্থন করে না।

তিন. মদিনা সনদ কেন ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি হতে পারে না এর সবচেয়ে বড় সত্য উত্তর হলো, ইসলামি শরিয়ত তখনো অপূর্ণাঙ্গ ছিল। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে অনেক বিধান এসেছে, যা মদিনা সনদে ছিল না। এমনকি তখন জিজিয়ার বিধানও ছিল না। ফলে মদিনা সনদ চূড়ান্ত এবং অকাট্য কোনো বিষয়ের মধ্যে পড়ে না যে, কেবল এর ভিত্তিতেই একটি ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।

চার. সর্বশেষ বিষয় হলো, কেউ যদি মদিনা সনদের ধারাগুলো ভালোভাবে লক্ষ করে তবে সেখানে সে কোনোভাবেই সেক্যুলার রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পাবে না। কারণ মদিনা সনদের অন্যতম প্রধান ধারাই হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চূড়ান্ত বিচারক হিসেবে মেনে নেওয়া। এই ধারাটি এতটাই সামগ্রিক যে মদিনা সনদের পরে আসা শরিয়তের সমস্ত বিধান শামিল করে নেয় এবং এই ধারার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শরিয়াই রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি; মদিনা সনদ নয়।

এ ছাড়াও কেউ কেউ সেক্যুলারিজমকে তার পারিভাষিক রূপ থেকে বের করে এর ইসলামি সংজ্ঞা দাঁড় করাতে চায়। এখানে কিছু সমস্যা আছে।

প্রথমত বিজাতীয় যেকোনো পরিভাষাকে ইসলামিকরণ করা শরিয়ত-সমর্থিত নয়। পরিভাষা অধ্যায়ে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ধরুন আমরা সেক্যুলারিজমের ইসলামি ব্যাখ্যা আবিষ্কারের চেষ্টা করছি।

আর সবাইকে বলে বেড়াচ্ছি আমরাও সেক্যুলারিজমকে আদর্শিকভাবে বিশ্বাস করি। এখানে সূক্ষ্ম পয়েন্ট হলো, আমরা আদর্শিকভাবে সেক্যুলারিজমকে একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের মানদণ্ড হিসেবে মেনে নিচ্ছি। এখানে যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক না কেন, সেক্যুলারিজম ফোকাসিং হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে ইসলামই যে একমাত্র মানদণ্ড, কুরআন-সুন্নাহই একমাত্র সত্য বাকি সব মিথ্যা, শরিয়তই একমাত্র নৈতিকতা এবং আদল-নিজেদের এই মানদণ্ড এবং দাবির জায়গায় আমরা দুর্বল হয়ে পড়ছি। এটা প্রথম সমস্যা যে আমরা মানদণ্ডের জায়গাতেই হেরে যাচ্ছি। আর বিশ্বব্যাপী তাদের মানদণ্ডই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাদের মানদণ্ডকে মেনে নিয়ে নানান ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে চাচ্ছি। মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নানা ব্যাখ্যা আওড়িয়ে বলেননি যে ইসলামেও কুফর আছে। কুফর কুফরই, এর কোনো ব্যাখ্যা নেই।

এর আরেক সমস্যা হলো, মানুষকে আমরা লুকোচুরির মাধ্যমে আশ্বস্ত করতে চাচ্ছি যে, আমরাও সেক্যুলারিজমের চর্চাকারী। এটা কখনো মানুষকে ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য নৈতিক কিংবা আদর্শিকভাবে প্রস্তুত করবে না। দিনে দিনে তাদের মনে সেক্যুলারিজম নামক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে। আর সেক্যুলারিজমের ভিন্ন ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া বলয় দিন দিন মূলধারার সেক্যুলারিজমেই ফিরে যাবে। ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর বাস্তবতা বিষয়টি আরো শক্তভাবে প্রমাণ করছে। বিভিন্ন দেশের নানা ইসলামি গণতান্ত্রিক দল ইসলামি ভাবধারা ও গঠনতন্ত্র বাদ দিয়ে ক্রমে ক্রমে আরও সেক্যুলার হয়েছে এবং হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত সেক্যুলারিজমের ইসলামি ব্যাখ্যাকাররা এর ইসলামি কাঠামোও দেখাতে পারছে না। সেক্যুলারিজমের যে কাঠামো তারা দেখানোর চেষ্টা করে, তা আসলে ইসলামসমর্থিত কাঠামো নয়। তারা সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞাগত দিকটাই ইসলামি হিসেবে দেখাতে চায় (আর এজন্যই তারা এরদোগানের তুরস্ককে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে। অথচ এরদোগানের দেশেও যেই সেক্যুলারিজমের চর্চা হয়, তা কখনোই ইসলামসমর্থিত নয়)। যেমন, যদি কেউ বলে সেক্যুলারিজমের মানে হলো সকল ধর্ম ও মতের প্রতি উদার এবং নিরপেক্ষ হওয়া, তা হলে তার এই দাবি ভুল। কারণ সেক্যুলারিজমের এই কাঠামোকেও ইসলাম সমর্থন করে

না। ইসলাম ইসলাম ছাড়া বাকি সব ধর্ম ও মতকে সমান অধিকার দেয় না। যেমন, সেক্যুলারিজম তার বাইরের কোনো মতকে সহ্যই করে না। (ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)

তৃতীয়ত, তারা যাকে সেক্যুলারিজম বলছে, তা আসলে সেক্যুলারিজম নয়। যেমন, ট্রাফিক আইন[১৩৫] কিংবা বর্তমান সময়ের নতুন কোনো বিষয়ের আইনকে ইসলামি শরিয়ত সেক্যুলারিজম বলে না। ইসলামে এটাকে কিয়াস কিংবা ইজতিহাদ বলে। সেক্যুলারিজমকে ইসলামিকরণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি উপেক্ষিত হয়, তা হলো তাওহিদুল হাকিমিয়্যাত। তাওহিদুল হাকিমিয়্যাত হলো রাষ্ট্রে ফয়সালা কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র ভিত্তি আল্লাহর শরিয়াহ হওয়া।

الحكم بما أنزل الله

(আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা রায়) প্রদানের চর্চা থাকা। ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তিই হচ্ছে এই হাকিমিয়্যাত। এটাকে আরো মজবুত করার জন্য 'দার'-এর প্রসঙ্গে যাওয়া যেতে পারে। দারুল ইসলাম কিংবা ইসলামি রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় সালাফরা যে বিষয়টি মুখ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তা হলো ইসলামি শরিয়াহ বিজয়ী হওয়া। ইসলামি বিধান প্রতিষ্ঠিত থাকা। এখানে 'দার' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। এ কারণেই ইসলামি ইমামাতের বাইয়াতই সংঘটিত হয় আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের উপর। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আল্লামা মাওয়ারদি রহিমাহুল্লাহর 'আহকামে সুলতানিয়া' দেখা যেতে পারে।

সুতরাং ব্যভিচারের অনুমোদন না দেওয়া, সুদের প্রচলনের সুযোগ না দেওয়া, জিম্মিদের থেকে ট্যাক্স নেওয়া, হুদুদ বাস্তবায়ন করা- এসব হাকিমিয়্যাতেরই অংশ। মুসলিমদের ব্যাপারে যে আদেশ-নিষেধ আছে, তা বাস্তবায়ন করা এবং অমুসলিমদের ব্যাপারে ইসলামি রাষ্ট্রে যে নির্দেশনা

---

[১৩৫] যদিও ফিকহের কিতাবে ট্রাফিক আইন নামে কোনো অধ্যায় নেই; কিন্তু শরিয়তের মৌলিক উসুলের ভিত্তিতে এসব বিষয়ে নানা নির্দেশনা ঠিক করা যেতে পারে। যেমন- নারী ট্রাকিফ নিয়োগ দেওয়া যাবে কি না, একজন ট্রাফিকের শ্রম ও ভাতা কত হবে, গাড়ি ডানে চলবে নাকি বামে ইত্যাদি। তা ছাড়া শরিয়তকর্তৃক ঘোষিত যেকোনো মুবাহ (বৈধ) বিষয় শরিয়তেরই অন্তর্ভুক্ত, যদিও তা নিয়ে পৃথক আলোচনা না থাকে।

রয়েছে, তা প্রয়োগ করাও হাকিমিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে অমুসলিমরা কোনো চুক্তি ভঙ্গ করলে, তার ব্যবস্থা নেওয়াও হাকিমিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত। আবার নতুন উদ্ভাবিত বিষয়কে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিচার করাটাও হাকিমিয়্যাহর আওতাভুক্ত। মোটকথা, ইসলামি শরিয়াহ ও আহকামকে বিচারকের মর্যাদা দেওয়া হলো হাকিমিয়্যাহ, যা প্রকারান্তরে আল্লাহ ও তার রাসুলকেই বিচারক মানা। তাওহিদুল হাকিমিয়্যাতকে না বুঝার কারণে তারা দুইভাবে ভ্রান্তির শিকার হচ্ছে।

এক. মুজতাহিদদের কর্ম ও সেক্যুলারদের আইনপ্রণয়নকে গুলিয়ে ফেলা। মুজতাহিদদের কাজ হলো কুরআন-সুন্নাহর প্রিন্সিপাল অনুযায়ী নতুন কোনো বিষয়ের শরয়ি হুকুম বের করা। তাদের কাজের ভিত্তি থাকে কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফদের বুঝ ও ব্যাখ্যা। সালাফদের বুঝকে পুঁজি করেই তারা ইজতিহাদ করেন। তারা নতুন নিজস্ব কোনো ব্যাখ্যার আশ্রয় নেন না এই ক্ষেত্রে। যারাই সালাফদের বুঝের বাইরে নিজস্ব ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চাইবে, তারাই সত্য পথ থেকে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

অন্য দিকে সেক্যুলারদের আইনের ভিত্তি থাকে মানবীয় প্রবৃত্তি ও বিবেক। তারা আল্লাহর হাকিমিয়্যাত প্রত্যাখ্যান করে, যাকে মহান আল্লাহ জাহিলিয়্যাতের হুকুম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১৩৬] সুতরাং মুজতাহিদদের কর্ম এবং সেক্যুলারদের আইনপ্রণয়নের মাঝে কোনো সামঞ্জস্য নেই। উভয়ের মাঝে বরং তাওহিদ ও শিরকের সম্পর্ক। একটি ঈমান, অপরটি কুফর।

দুই. ইসলামি শরিয়তকে অপূর্ণাঙ্গ এবং অপর্যাপ্ত হিসেবে দেখানো। এমন দাবি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দেওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক।[১৩৭] আমরা জানি আমাদের দীন কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য পালনীয় একমাত্র দীন। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই ইসলামি শরিয়তে মানবজাতির পার্থিব ও পরকালীন জীবনের সমস্ত প্রয়োজনের সমাধান ও নির্দেশনা পূর্ণরূপে থাকবে। এজন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন,

---

[১৩৬] সুরা মায়িদা, আয়াত ৫০

[১৩৭] সুরা মায়িদা, আয়াত ৩

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

> আমি আপনার কাছে এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক জিনিসের সুস্পষ্ট বিবরণী হিসেবে।[১৩৮]

ইমাম শাতেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ এই শরিয়তকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন, যার মাঝে মানুষের ইবাদত ও দায়িত্ব পালন এবং জীবনপরিচালনার প্রয়োজনীয় সমস্ত দিকনির্দেশনার সুস্পষ্ট বিবরণ আছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই দীনের পরিপূর্ণতা লাভের স্বীকৃতি নিয়েই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

> আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম।[১৩৯]

সুতরাং যে ব্যক্তি মনে করবে এই দীন পূর্ণাঙ্গ নয়; পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য আরো কিছু বিষয়ের প্রয়োজন রয়েছে, সে আল্লাহর এই আয়াত অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হবে। দীন পরিপূর্ণ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, মানব-জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে শরিয়ত মৌলিকভাবে কোনো না কোনো নির্দেশনা দিয়েছে। অর্থাৎ একটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এখন এসব মূলনীতি থেকে শাখাগত বিষয়ের সমাধান খুঁজে বের করার দায়িত্ব মুজতাহিদদের উপর ন্যস্ত থাকবে।[১৪০] মনে রাখতে হবে শরিয়তের মূলনীতি মেনে মুজতাহিদগণ নব উদ্ভাবিত যেসব বিষয়ের মাসআলা বের করেন, যদিও তা বাহ্যত মানবীয় সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অবশ্যই 'বিমা আনযালাল্লাহ' (আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন) এর অন্তর্ভুক্ত; যদিও তা প্রকাশ পায় একজন মুত্তাকি মুজতাহিদের গবেষণার মাধ্যমে। কারণ, এখানে মূলনীতি মানা হচ্ছে শরিয়তকে।

---

[১৩৮] সুরা নাহল, আয়াত ৮৯

[১৩৯] সুরা মায়িদা, আয়াত ৩

[১৪০] আলই'তিসাম- ৪৯১; ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন- ১/৩৩২-৩৩৪; আলমুওয়াফাকাত- ২/৭৯

আমাদের শরিয়ত পরিপূর্ণ। মানব-জীবনের এমন কোনো অধ্যায় নেই, যার ব্যাপারে শরিয়ত বৈধতা বা অবৈধতার আদেশ-নিষেধ জারি করেনি। এখন হতে পারে বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে অথবা কোনো মূলনীতির আওতায় এর আলোচনা রয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন কোনো নতুন বিষয় সামনে আসেনি, যা ইসলামের কোনো মূলনীতির আওতায় পড়েনি কিংবা তার ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম প্রয়োগ করা যায়নি। শরিয়তের নস নির্দিষ্ট; কিন্তু সেগুলো ব্যাপক। কিয়ামত পর্যন্ত যত বিষয় আসবে ও ঘটবে, শরিয়ত সবকিছুর জন্য যথেষ্ট। এই শরিয়তে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবজাতির যেকোনো সমস্যার সমাধানের দিকনির্দেশনা রয়েছে।

ল’ অফ পিপলস

জাতিগতভাবে ইসলামের Law of Peoples হলো- যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না, তাদের মধ্যে যারা জিজিয়া দিতে সম্মত হবে, তারাও নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু যারা জিজিয়া দিতেও অস্বীকার করবে, তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। ঠিক সেক্যুলারিজমেরও এমন একটি Law of Peoples আছে। আদতে সেক্যুলারিজম ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, বরং পৃথক একটি ধর্ম। এখন লিবারেল সেক্যুলারিজমের ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী পারস্পরিক ও জাতীয় সম্পর্ক কেমন হবে, অ-লিবারেলদের সাথে লিবারেলদের আচরণ কী হবে, কার বিরুদ্ধে কখন যুদ্ধ করতে হবে— এমনসব প্রশ্নের উত্তরে সেক্যুলার বুদ্ধিজীবীরা অনেক কিছুই লিখে গেছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক John Rawls তার বিখ্যাত The Law of Peoples গ্রন্থে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে গিয়ে মানুষকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে। বইটিতে লেখক ‘কাজানিস্তান’ নামের একটি কল্পিত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ধরে নিয়েছে, যেখানে মুসলমানদের রাজত্ব চলে এবং ইসলামি শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত আছে।[১৪১] যার ফলে Rawls মানুষকে চার ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে:

এক. লিবারেল। এরা হচ্ছে সেক্যুলারদের দৃষ্টিতে ন্যায়ের প্রতীক এবং সমস্ত লিবারেল রীতিনীতি মেনে চলে।

দুই. ডিসেন্ট (decent)। এরা যদিও পরিপূর্ণ লিবারেলিজমের প্রবক্তা নয়; কিন্তু হিউম্যান রাইটস-এর কিছু কনসেপ্ট মানে এবং বাস্তবায়ন করে। এমন লোকদের তিনি decent hierarchical societies বলেন। তার মতে, লিবারেল লোকদের এমন ডিসেন্ট লোকদের সাথে পারস্পরিক

---

[১৪১] বইটি লেখা হয় ১৯৯০ সালে, যখন রাশিয়াকে পরাজিত করে ইসলামিবিশ্ব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকাকে এই বার্তা দেওয়া যে, আমেরিকা এখন মুসলমানদের সাথে কীরূপ আচরণ করবে।

সংলাপে আসা উচিত। তাদের সাথে এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে, যা তাদের উসকে দেয়। কারণ এতে এজেন্ডা বাস্তবায়নে বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে। রলস-এর দাবি হলো, এই ডিসেন্ট লোকেরা ধীরে ধীরে স্বভাবগত অবস্থায় (original position) ফিরে আসবে, যা লিবারেলিজমের দৃষ্টিতে সত্য এবং সঠিক। এজন্য তাদের সাথে লড়াই করার প্রয়োজন নেই।[১৪২]

তিন. Outlaw. এরা সেসব লোক, যারা হিউম্যান রাইটসকে প্রত্যাখ্যান করে এবং একে চ্যালেঞ্জ করে। রলস-এর পরামর্শ হলো, এমন লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। এরা পৃথিবীর জন্য হুমকি। এদের সাথে সংলাপ-আলোচনা অনর্থক।

চার. বার্ডেন্ড (burdened)। এরা হচ্ছে অর্থ-সম্পদহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী। বিভিন্ন কারণে তারা দরিদ্রতায় ভুগছে এবং লিবারেলিজমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তারা সামগ্রিকভাবে অক্ষম। রলস-এর মতে লিবারেল ও ডিসেন্ট লোকদের দায়িত্ব হলো এমন লোকদের আর্থিকভাবে সাহায্য করা, যাতে করে এরা তাদের মতোই লিবারেল এবং ডিসেন্ট হয়ে যায়।

লিবারেলিজমের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত অবৈধ থাকবে, যতক্ষণ অ-লিবারেল লোকেরা লিবারেলিজমের কিছু নীতি ও শর্ত মেনে চলবে। এবার রলস ও শরিয়তের দাবি সামনে রেখে একটু চিন্তা করুন যে, উভয়ের মাঝে মৌলিক পার্থক্য কী? পার্থক্য এটাই যে, আল্লাহ ইসলামকে যেই 'হক'-এর মর্যাদা দিয়েছেন, রলস লিবারেলিজমকে সেই মর্যাদার জায়গায় রাখছে (মাআজাল্লাহ)। অর্থাৎ, এখানে সরাসরি রবের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে। ইসলামের ল' অফ পিপলস ঈমানকে ঘিরে আবর্তিত হয় আর পাশ্চাত্যের ল অফ পিপলস হিউম্যানিজমকে ঘিরে আবর্তিত হয়। অথচ এক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান দেখানো হয় গোঁড়া, কট্টর ও বর্বর হিসেবে আর তারা তো নাম ধারণ করেই আছে লিবারেল। কী নির্মম বৈপরীত্য!

---

[১৪২] এখানে 'স্বভাবগত অবস্থা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেকুলার হয়ে যাওয়া। তাদের কাছে এটাই মানুষের অরিজিনাল অবস্থা। ফলে কেউ যদি সেকুলার নীতির বাইরে চলে যায়, সে তাদের কাছে আর মানুষ বলে গণ্য হয় না।

আমরা যদি পৃথিবীর বর্তমান বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি দিই, তা হলে দেখতে পাব সাম্রাজ্যবাদীরা এই ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ীই শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করছে এবং নিজেদের পলিসি নির্ধারণ করছে। এজন্যই তারা শরিয়তের দাবিদার প্রত্যেক সদস্যকে নিজেদের জন্য হুমকি মনে করে। যারাই শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তোলে, তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে। কারণ তাদের দৃষ্টিতে, এসব লোক হলো Outlaw. পক্ষান্তরে মুসলিমদের মধ্যে যারা পাশ্চাত্যকে আদর্শগতভাবে কিংবা কার্যত মেনে নিয়েছে, তাদের সাথে সংলাপ-আলোচনা চলে। তাদেরকে ঘুমপাড়ানি গল্প শুনিয়ে পেলে-পুষে রাখে। এরা হচ্ছে ডিসেন্ট। আর এদের অনেকে ঠিকই একটা পর্যায়ে 'রলস'-এর দাবি অনুযায়ী লিবারেলিজমকে পলিসি হিসেবে গ্রহণ করে নিচ্ছে। আর বর্তমানে বার্ডেন্ড হলো, বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবির এবং গরিব অঞ্চল, যেখানে আন্তর্জাতিক এনজিও সংস্থাগুলো রলস-এর দেখানো পদ্ধতিতে কাজ করছে।

এখানে ২০০৩ সালে র‍্যান্ড কর্পোরেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম' নামক রিপোর্ট খুবই প্রাসঙ্গিক।[১৪৩] কারণ এই রিপোর্টে পাশ্চাত্যের ল' অফ পিপলস এবং সে অনুযায়ী তার পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। জন রলস-এর বিভাজনটি ছিল অনেকটা ব্যাপক। সে কোনো বিশেষ ধর্ম কিংবা গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করে এই বিভাজন-নীতির আলোচনা করেনি। কিন্তু র‍্যান্ড কর্পোরেশন কেবল মুসলিমদের চিহ্নিত করে এবং তাদেরকে চার ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করে। এই রিপোর্টে র‍্যান্ড মুসলিমদের চার ভাগ করে দেখানোর চেষ্টা করে

---

[১৪৩] RAND Corporation। আমেরিকান গ্লোবাল পলিসি থিংক ট্যাংক হিসেবে সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত পরিচিত নাম। RAND Corporation শব্দের বিস্তারিত রূপ হলো Research and Development Corporation। র‍্যান্ড কর্পোরেশন হলো অ্যামেরিকার একটি এনজিও প্রতিষ্ঠান। এর কাজ হলো আমেরিকার অর্থনৈতিক, সামাজিক, সমরনৈতিক, রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক নীতিনির্ধারণী বা থিংক ট্যাংক হিসেবে গবেষণা করা। এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত আলোচনা-পর্যালোচনার পর যেকোনো ধরনের মার্কিন নীতি বা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে আমেরিকাকে সারাবিশ্বে একক পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জেনারেল হেনরি হাপ আর্নল্ডের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম RAND Corporation-এর যাত্রা সূচিত হয়। এরপর ক্রমে ক্রমে তার খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

যে আমেরিকা কোন ভাগের সাথে কীরূপ পলিসি গ্রহণ করবে। সেই চার ভাগ হলো :

ফান্ডামেন্টালিস্ট মুসলিম

অর্থাৎ মৌলবাদী ও চরমপন্থি মুসলিম। এরা সেসব মুসলিম, যারা ইসলামকে শুধু কতক আচার-অনুষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত আচার-ইবাদতের ধর্ম মনে করে না; বরং ইসলামকে মনে করে এক পরিপূর্ণ দীন এবং মানব-মুক্তির অবিকল্প জীবনব্যবস্থা। যারা চায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নাজিলকৃত বিধান দিয়ে শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনা করতে, চায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিসরেও ইসলামকে একচ্ছত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে; এক কথায়, তারা আল্লাহর দীনকে সবক্ষেত্রেই বিজয়ী রাখতে চায়। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তারা কোনোক্রমেই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে মেনে নেয় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান শত্রু তারা। যেকোনো মূল্যে এদের বিনাশ করা পাশ্চাত্যের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। জন রলস-এর ভাষ্যমতে এরা হবে Outlaw।

ট্রাডিশনালিস্ট মুসলিম

অর্থাৎ ঐতিহ্যবাদী মুসলিম। এরা হচ্ছে সেসব মুসলিম, যারা ইসলামের ঐতিহ্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রেখেছে। দীনের প্রাচীন ধারার ইলমচর্চা, ধর্মপ্রচার এবং আত্মশুদ্ধিকেন্দ্রিক কাজগুলোকেই যারা ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে আছে। এরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জন্য কিছুটা হুমকি হলেও পুরো সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর নয় (সময়-সুযোগমতো এদেরকেও দমিয়ে দেওয়া পাশ্চাত্যের পলিসি)। হ্যাঁ, তবে এরা যদি কোনোভাবে ফান্ডামেন্টালিস্ট মুসলিমদের সঙ্গে মিলে যেতে পারে, তবে এরা পাশ্চাত্যের জন্য বিপদ এবং মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এজন্য যেকোনো উপায়ে এদেরকে তাদের নিজ নিজ পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কোনোভাবে ফান্ডামেন্টালিস্ট মুসলিমদের সঙ্গে মিলতে দেওয়া যাবে না। বরং সাধ্যানুসারে উভয় দলের মধ্যে কোন্দল ও বিভেদ জিইয়ে রাখতে হবে। পারলে এদেরকে ছলে বলে কৌশলে ইসলামের ট্রাডিশনাল জ্ঞানতত্ত্ব ও ব্যাখ্যার ধারা থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তার সাথে আপসের আহ্বান জানাতে হবে। পাশাপাশি এদেরকে মডারেট মুসলিমদের প্রতি সহনশীল করে তুলতে হবে।

মডারেট মুসলিম

অর্থাৎ আধুনিকতাবাদী মুসলিম। এরা আদি ও আসল ইসলামকে বর্তমান সময়ের জন্য অকার্যকর ও সেকেলে মনে করে। তাই ইসলামকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে চায়, ইসলামের পরিমার্জিত সংস্করণ বের করতে চায়। এদের এসব ব্যাখ্যার পেছনে মূল উদ্দেশ্য ইসলামকে প্রবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। ইসলামকে পাশ্চাত্য ধারার জীবনব্যবস্থা এবং তার সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করা, যাতে করে ইসলামের ইতিবাচক দিকগুলোও পালন করা যায়, আবার প্রবৃত্তিপূজার অংশ হিসেবে নেতিবাচক দিকগুলোর মধ্যেও অংশগ্রহণ করা যায়। এরা ইসলামের এক নতুন ভার্সন আবিষ্কার করতে চায়, যা পাশ্চাত্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হবে। পাশ্চাত্যের সাথে যেকোনো সংঘাতকে প্রত্যাখ্যান করবে, হোক সেই সংঘাত ঈমান ও কুফরের সাথে।

র‍্যান্ডের পলিসি সাজেশন হলো, মডারেট মুসলিমদের সাহায্য করতে হবে, এদের জন্য ফান্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। আর বিশেষভাবে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় এদের প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। যেহেতু সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এদের উল্লেখযোগ্য অবস্থান ও সবিশেষ গ্রহণযোগ্যতা নেই, তাই মিডিয়ার মাধ্যমে এদেরকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে, যাতে তাদের আহ্বান মানুষের কানে পৌঁছে যায়।

২০০৩ সালের 'সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম' শীর্ষক রিপোর্টের পর ২০০৭ সালে Building Moderate Muslim Networks নামে একটি বিস্তারিত ফলোআপ রিপোর্ট প্রকাশ করে RAND।[১৪৪] এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকা-বান্ধব মডারেট ইসলামকে মুসলিমদের মাঝে ব্যাপক করার জন্য পাশ্চাত্যের পলিসি নিয়ে আলোচনা করা। পাশাপাশি এটা দেখানো যে পাশ্চাত্যের জন্য এই মডারেট ইসলামকে জনপ্রিয় করে তোলা কেন প্রয়োজন।

২০১৩ সালে Promoting Online Voices for Countering Violent Extremism নামে আরেকটি রিপোর্ট প্রকাশ করে RAND।[১৪৫]

---

[১৪৪] https://www.rand.org/pubs/monographs/MG574.html

[১৪৫] https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR130.readonline.html

এই রিপোর্টে মডারেট ইসলামের প্রচারের জন্য এবং 'প্রকৃত ইসলামি শিক্ষা'কে (যাকে RAND 'কট্টরপন্থা' বলে) মোকাবিলা করার জন্য মিডিয়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। এখানে সুনির্দিষ্টভাবে সেসব ব্যক্তি ও সংগঠনের নাম চলে আসে, মুসলিম কমিউনিটির মধ্য থেকে যারা মডারেট ইসলাম বা আমেরিকা-বান্ধব ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে। এদেরকে নিয়েই আমেরিকার সব আয়োজন। উল্লিখিত সব রিপোর্টেই আমেরিকা এদেরকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। যেভাবেই হোক ফান্ডিং করে তাদেরকে মিডিয়ায় ফলোআপ করা, তাদের লিখিত বইপত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া আর এজন্য পাশ্চাত্যের সবধরনের প্রচার-মাধ্যমকে ব্যবহার করার জন্য প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে রিপোর্টগুলোতে।

আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে, এসব রিপোর্টের টার্গেট নির্দিষ্ট কোনো সন্ত্রাসী (জিহাদি) সংগঠন না। এদের মূল টার্গেট ইসলাম। কারণ তারা নির্লজ্জের মতোই জানিয়ে দিচ্ছে যে, ওয়াশিংটন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে যাচ্ছে এমন এক প্রচারণায়, যার উদ্দেশ্য কেবল মুসলিম-সমাজকেই প্রভাবিত করা নয়; বরং ইসলামকেই বিকৃত করে ফেলা। যদি কেবল সন্ত্রাস নিয়েই তাদের মাথাব্যথা থাকত, তা হলে কেন ইসলামকে বিকৃত করে ফেলার এতো প্রয়োজন পড়ল তাদের? কেন পাশ্চাত্য-বান্ধব ইসলাম আবিষ্কারে তাদের এতো আগ্রহ? তারা এমন এক ইসলাম তৈরি করতে চায়, যা আদতে কুফর, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরিয়াহর সাথে যার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

তাই আমাদের কর্তব্য হলো ইসলামের যেসব বিষয়কে এরা অপপ্রচারের মাধ্যমে বিতর্কিত করতে চায়, তাকে আপসহীনভাবে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। যেসব মুসলিম ব্যক্তিত্ব ইসলামের হুদুদ, জিহাদ, খিলাফাহ, ওয়ালা বারা, হাকিমিয়্যাহ ইত্যাদির ব্যাপারে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে, তাদের থেকে নিজের সাবধান হওয়া এবং অন্য মুসলিমদের সতর্ক করা। নিজেদের খেয়াল-খুশি মোতাবেক ইসলাম না খুঁজে শরিয়াহর অকাট্য দলিলের আলোকে ইসলাম বুঝা।

সেক্যুলারিস্ট মুসলিম

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুসলিম। এরা প্রথম থেকেই আমেরিকার পকেটে রয়েছে। তাই এদের নিয়ে আলাদা চিন্তা বা মাথাব্যথা নেই। এরা কারও জন্য কোনো ঝুঁকির কারণ নয়। সেক্যুলারিস্ট মুসলিমরা মূলত মুসলিমই নয়। কারণ, তারা ইসলামকে কেবল ব্যক্তি-জীবনে পালনীয় ধর্ম মনে করে এবং রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা মনে করে। এদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি থাকবে ধর্মের বলয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। রলস-এর ভাষায় এরাই হলো লিবারেলিস্ট।[১৪৬]

এমন সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী নীতি অনেক পশ্চিমা দার্শনিকের বক্তব্যেও পাওয়া যায়। যেমন রুশো বলেছেন,[১৪৭] 'পৃথিবীর যে সৃষ্টিই পাশ্চাত্য সমাজ ও জীবনধারা অস্বীকার করে, সে নিজেকে মানুষ দাবি করার যোগ্য থাকে না। নফসপূজারি না হওয়াই একজন মানুষের পাগল হওয়ার দলিল হিসেবে যথেষ্ট। এই সভ্য সমাজে এমন সন্ত্রাসীদের বিহিত শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমেই করতে হবে আমাদের সভ্যতার জন্য তাদের হুমকি হয়ে ওঠার আগেই। আর যদি কোথাও পুরো সমাজই এমন সন্ত্রাসী হয়ে যায় (যেমন তালেবান) তা হলে যেসব সভ্য সমাজ আমাদের নীতি মেনে নিয়েছে, তাদেরকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মাধ্যমে সেই সন্ত্রাসী সমাজের বিরুদ্ধে মিশনের বৈধতা দেওয়া হবে। এমন অসভ্য, জঙ্গি লোকদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হবে, যেন বাকি মানব-সমাজ 'হিউম্যান' হয়ে জীবনযাপন করতে পারে।[১৪৮]

---

[১৪৬] মুসলিমদের সাথে পাশ্চাত্যের আচরণবিধি প্রসঙ্গে এখানে র‍্যান্ডের প্রতিবেদনগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো এটা স্পষ্ট করা যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা কতটা সাম্প্রদায়িক। তবে আমাদের জন্য এই রিপোর্টগুলোতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ইসলামকে বিকৃত ও পাশ্চাত্যকরণের পিছনে তাদের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে জানা ও বুঝা। এর পিছনে কারা, কীভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং তাদের কাজের পদ্ধতিগুলো ইসলামের সাথে কেন সাংঘর্ষিক- এই বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ নিয়ে পৃথক গ্রন্থের প্রয়োজন। আমরা দোয়া করব আল্লাহ উম্মাহর এই প্রয়োজন পূরণ কে্ দেবেন ইনশাআল্লাহ।

[১৪৭] রুশোর বক্তব্যে সরাসরি পাশ্চাত্য সমাজের কথা উল্লেখ নেই। সে খায়েশ পূরণের জন্য গঠিত সামাজিক কাঠামোর কথা বলেছে। আর এটাই পাশ্চত্য সমাজব্যবস্থার মূল উপাদান।

[১৪৮] cole, Cameroon and Edward [1983], p.105

বিভিন্ন সময় আমাদের মুসলিম ভাইদের গ্রেফতার দেখানো হয়। তাদের অপরাধ হিসেবে দেখানো হয়, তারা গণতন্ত্র কিংবা সেক্যুলারিজমে বিশ্বাসী নয়। এগুলোকে তারা কুফুরি ব্যবস্থা মনে করে। এই অপরাধের কারণেই একটা সেক্যুলার রাষ্ট্র তাদের বসবাসের অধিকার কেড়ে নেয়। কারণ তাদের ল' অফ পিপলস অনুযায়ী এরা পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য চরম হুমকি। এজন্যই পশ্চিমাবিশ্ব এদেরকে চরমপন্থি হিসেবে আখ্যায়িত করে; অথচ কোনো মুসলিমই এসব মতবাদে বিশ্বাসী হতে পারে না।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এসব পাশ্চাত্য মতবাদকে অধিকাংশ মুসলিমই আজ আদর্শিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। আমরা যদি সত্যিই নিজেদের ঈমানের ব্যাপারে সিরিয়াস ও সংবেদনশীল হই তা হলে আমাদের উচিত এসব মতবাদ প্রত্যাখ্যান করা। আজকে আমরা মুসলিম নাম ধারণ করেও পাশ্চাত্যের ল' অফ পিপলস মেনে নিচ্ছি; অথচ নিজেদের ল' অফ পিপলস বিকৃত করছি। যারা ইসলামের ল' অফ পিপলস প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদেরকে উগ্রবাদী বলে দূরে ঠেলে দিচ্ছি। আমাদের জন্য উচিত ছিল পাশ্চাত্যের ল' অফ পিপলস দেখে নিজেদের শত্রু-মিত্র চিনে নেওয়া। পাশ্চাত্য কেন মুসলিমদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করল, কেন প্রত্যেক ক্যাটাগরির সাথেই ভিন্ন ভিন্ন আচরণবিধি নির্ধারণ করল, এর পেছনে কী তাদের উদ্দেশ্য— এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবলে আমরা অবশ্যই আমাদের শত্রু-মিত্র চিনতে পারব। সাথে সাথে এই পরিস্থিতিতে নিজেদের করণীয়ও নির্ধারণ করতে পারব। দরকার কেবল নিজেদের ঈমান ও দীনের ব্যাপারে একটু সিরিয়াস হওয়ার।

উপসংহার

এক.

কয়েক যুগ আগে থেকেই মুসলিমদের কেউ কেউ বুঝতে শুরু করেছে যে পুরো মুসলিমবিশ্ব রাজনৈতিকভাবে এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার দাসত্ব বরণ করে নিয়েছে। মুসলিমদের অধিকাংশই পাশ্চাত্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। মুসলিমদের প্রতিটি ঘর এবং ঘরানাই 'ফিতনাতুল মাগরিবে' (পশ্চিমা ফেতনায়) আক্রান্ত। যারা এর ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছে এবং বাহ্যিকভাবে এই ফেতনা থেকে মুক্তির চেষ্টা করছে, তাদের অনেকেই একে সঠিকভাবে বুঝতে ভুল করেছে। ফলে এই ফেতনার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কেউ কেউ ভুল পন্থা অবলম্বন করছে। এজন্যই দেখা যায়, পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে কলমধারী ব্যক্তিটি নিজেই পাশ্চাত্য প্রোপাগান্ডা ও চিন্তাধারায় আক্রান্ত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে পাশ্চাত্যের মোকাবিলায় লিখিত বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থে পাশ্চাত্য চিন্তাচেতনার ছাপ পাওয়া যায়। কারণ, সেগুলো লেখার সময় পাশ্চাত্যের প্রতিষ্ঠিত থিউরিগুলো ফলো করা হয়।

পাশ্চাত্যকে মোকাবিলা করার পূর্বশর্ত হলো গভীর থেকে পাশ্চাত্যকে চেনা। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'ইসলামের বন্ধন একটি একটি করে তখনই ছুটতে থাকবে, যখন ইসলামের মাঝে এমন লোকদের আবির্ভাব ঘটবে, যারা জাহিলিয়্যাতকে চিনবে না।'[১৪৯] কারণ বান্দা যখন জাহিলিয়্যাত ও তার হুকুম সম্পর্কে না জানবে, তার সামনে 'অপরাধীদের পথ' স্পষ্ট না থাকবে, আশংকা আছে সে তাদের পথই 'মুমিনদের পথ' মনে করবে। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরিয়তের পরিপন্থি সবকিছুই জাহিলিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত। জাহিলিয়্যাত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে বর্তমান উম্মাহ

---

[১৪৯] মাজমুউল ফাতাওয়া লি ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ.- ১০/৩০১

ইলম, আমল ও ঈমানের ক্ষেত্রে মুমিনদের পথ মনে করে কাফের ও অপরাধীদের পথ ধরে চলছে, এর প্রতি অন্যদের আহ্বান করছে, বিরোধিতাকারীদের প্রত্যাখ্যান করছে এবং আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাব্যস্ত-করা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করছে। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চান আমরা তার শত্রুদের ব্যাপারে জেনে তাদের থেকে দূরে থাকি এবং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করি। আর তার বন্ধুদের ব্যাপারে জেনে তাদের ভালোবাসি এবং তাদের পথের অনুসরণ করি।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই উক্তির আলোচনা করতে গিয়ে ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ মানুষদের চার ভাগ করেন।

১. যারা ঈমান ও কুফর উভয়ই ভালোভাবে চেনে এবং তাদের কার্যক্রম সম্পর্কেও অবগত। পৃথিবীতে এরাই সবচেয়ে জ্ঞানী।

২. যারা শুধু ঈমান চেনে; কিন্তু কুফুরের ব্যাপারে অবগত নয়; তবে তারা ঈমানের পথের বাইরে সবকিছু প্রত্যাখ্যান করে। এরাও কুফুর থেকে নিরাপদ থাকতে সক্ষম হয়।

৩. যারা বিস্তারিতভাবে কুফুরকে জানে; কিন্তু ঈমানকে জানে ভাসা-ভাসা অবস্থান থেকে। তারাও পরিপূর্ণ নিরাপদ নয়।

৪. যারা ঈমান ও কুফুর কোনো পথই ভালোভাবে চেনে না। এরাই সবচেয়ে ভয়ংকর অবস্থানে আছে।[১৫০]

বর্তমান মুসলিমদের অবস্থা চতুর্থ শ্রেণির মতো। একদিকে তারা ইসলামের বিশুদ্ধ ও সঠিক অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে বসে আছে কিংবা সেই অবস্থানকে জেনেও প্রত্যাখ্যান করছে নানা অজুহাতে। অপরদিকে পাশ্চাত্য জাহিলিয়্যাত সম্পর্কে তারা একেবারেই বেখবর। এজন্য পাশ্চাত্যকে মোকাবিলা করার প্রথম ধাপেই আমাদের করণীয় হলো নিজেদের দীন সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা। ইসলামি সভ্যতাকে সঠিক অবস্থান থেকে চেনা। একইসাথে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ভালোভাবে বুঝা। এর প্রভাব এবং গভীরতা অনুধাবন করা। মুসলিম-সমাজের

---

[১৫০] আল ফাওয়ায়েদ লি ইমাম ইবনুল কাইয়ুম রহ.- ১৩৫-১৩৮

ভেতর দীনের প্রকৃত ইলম ও আপসহীন দাওয়াহ ছড়িয়ে দেওয়া, যে ইলম ও দাওয়াহ হবে পাশ্চাত্যের ছাপমুক্ত। মডারেশন ও রিভিশনিজম[১৫১] মুক্ত ইলম এবং দাওয়াহই উম্মাহকে আবার বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করতে সক্ষম। ইসলামাইজেশনের ধাঁচে সাজানো ইলম ও দাওয়াহ আমাদের আরো দুর্বল করবে। আমাদের বন্দি করবে পাশ্চাত্যের শেকলে। 'মুজাদ্দিদে আলফেসানি'র[১৫২] আপসহীন দাওয়াহই পারে একবিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়্যাতে আঘাত হানতে। স্বচ্ছতা, সততা ও আমানতদারির সঙ্গে আপসহীনভাবে হৃদয়গ্রাহী করে ইসলামের মৌলিক আদর্শ তুলে ধরা এবং প্রচার করার মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আমরা পাশ্চাত্যের মোকাবিলা করতে পারি।

দুই

নিশ্চিতভাবেই আমরা ফেতনার যুগে বাস করছি। আর ফেতনার সময় আমাদের করণীয় কী এবং কীভাবে ফেতনার মোকাবিলা করব বিষয়টি এক হাদিসে খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। ফেতনার জামানায় মুসলমানদের জন্য সামগ্রিক এবং সংক্ষিপ্ত দিকনির্দেশনা হলো এই হাদিস। ফেতনার যুগের দুই ধরনের ব্যক্তিকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম বলেছেন।

---

[১৫১] ১৮নং টীকা দ্রষ্টব্য

[১৫২] শায়েখ আহমাদ সিরহিন্দি রহিমাহুল্লাহ (১৫৬৩-১৬২৪)। তার যুগে বাদশাহ আকবার ছিল ভারতবর্ষের শাসক। আকবর দীনে এলাহী নামে এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেছিল। শায়েখ সিরহিন্দি রহিমাহুল্লাহ অত্যন্ত আপসহীনভাবে দীনে এলাহীর বিরুদ্ধে দাওয়াতি কার্যক্রম চালিয়েছিলেন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী ব্যক্তিদের কাছেও তিনি দীনে এলাহীর ভ্রান্তি এবং ইসলামের শাশ্বত অবস্থান নির্ভয়ে তুলে ধরেছেন কোনো প্রকার আপস এবং বিকৃতি ছাড়াই। আকবরের দীনে এলাহীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার ফলে তাকে কারাবরণও করতে হয়েছে। এ ছাড়াও তখনকার সময়ে ভারতবর্ষের মুসলিমদের অবস্থা নানামুখী ফেতনার কারণে সংকটময় ছিল। শায়েখ সিরহিন্দি মুসলিম সমাজকে সালাফে সালিহিনের আদর্শের উপর নিয়ে আসতে নানামুখী তৎপরতা চালিয়েছেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা শায়েখকে সফলতাও দান করেছেন। এজন্য তাকে মুজাদ্দিদে আলফেসানি তথা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক বলা হয়। (তাহরীকে দেওবন্দ, শায়েখ আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়াহ রহ.)

ক. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়ার লাগাম ধরে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। যখনই শত্রুর উপস্থিতি বা শক্তির দিকে ধাবমান হওয়ার আহ্বান শুনতে পায় তখন সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে দ্রুত বের হয়ে পড়ে এবং যথাস্থানে পৌঁছে শত্রুদের নিধন করে গাজি হয়ে ফিরে আসে কিংবা শহীদের মর্যাদা লাভ করে।

খ. যে ব্যক্তি তার মেষপাল নিয়ে কোনো পাহাড় বা নির্জন উপত্যকায় বাস করে। যথারীতি সালাত কায়েম করে, জাকাত পরিশোধ করে এবং আমৃত্যু তার প্রভুর ইবাদতে লিপ্ত থাকে।[১৫৩]

উল্লিখিত হাদিসে সুস্পষ্টভাবেই বর্তমান সময়ে আমাদের করণীয় সম্পর্কে বলে দেওয়া হয়েছে। ফেতনার জামানায় করণীয় সংক্রান্ত হাদিসগুলোর ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে, এই সময়ে মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ হলো দীনি কাজে মশগুল থাকা। বিশেষত আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের কাজে সময় ব্যয় করা। নির্জনবাস থেকেও এটা উত্তম এবং নিরাপদ।

আর যদি দাওয়াহ এবং জিহাদে লিপ্ত থাকতে না পারা যায় তা হলে খারাপ সঙ্গ, পরিবেশ এবং মাধ্যম ত্যাগ করে চলা। সৎ মানুষ এবং পবিত্র স্থানের সঙ্গ গ্রহণ করা। এর বাইরের সময়টুকু দীন ও ইবাদতের চিন্তাভাবনায় নির্জনতা অবলম্বন করা। ফেতনার সময় নির্জনবাসের অর্থ এটাই। মোল্লা আলি কারি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মধ্যমপন্থা হলো সাধারণ মানুষ থেকে নির্জনতা অবলম্বন করা আর সৎলোকদের সঙ্গ দেওয়া।'[১৫৪]

বর্তমান বাস্তবতায় এটাই নির্জনতার অর্থ। তা ছাড়া ইসলামের আমর-নাহির (সৎকাজের আদেশ করা, অসৎকাজ বারণ করা) মতো অনেক বিধান আছে সমাজঘনিষ্ট। যদি হাদিসের অর্থ সমাজ থেকে সরে যাওয়া বুঝায় তা হলে ইসলামের সামগ্রিক রূপরেখার সাথে সাংঘর্ষিকতা দেখা যায়। মূলত বাতিল সুফিজমের নানান বিদআতি এবং শিরকি বিশ্বাসের পাশাপাশি জগৎ-বিচ্ছিন্নতার বিশ্বাস ইসলামের অনেক ক্ষতি করেছে।

---

[১৫৩] সহিহ মুসলিম- ১০০৪; ইবনে মাজাহ- ৩৯৭৭
[১৫৪] মিরকাতুল মাফাতিহ- ৪/৭৪৩

তিন.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অন্ধকার রাতের মতো ফেতনা আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে বিকালে কাফের হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন থাকলে সকালে কাফের হয়ে যাবে। (মানুষ) দুনিয়ার তুচ্ছ সামগ্রীর বিনিময়ে তার দীন বিক্রি করে ফেলবে।'[১৫৫]

এই হাদিসে যে ফেতনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো ইরতিদাদের ফেতনা। ইরতিদাদ মানে হলো কারো দীনে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া। যখন-তখন মানুষের কাফের হয়ে যাওয়ার দ্বারা এখানে আধিক্য বুঝানো হয়েছে। যেদিন আমি হাদিসটি প্রথম শুনি, সেদিন থেকেই এর বাস্তবতা নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলাম। এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে- এই ভাবনা আমাকে আহত করত। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার বাস্তবতা আমার সামনে হাদিসের বাস্তবতা স্পষ্ট করে দিয়েছে। মাওলানা আবুল হাসান আলি নদবি রহিমাহুল্লাহ যখন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে শতাব্দীর বৃহত্তর এবং ভয়াবহ ইরতিদাদি ফেতনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন,[১৫৬] তখন বিষয়টি বুঝা আমার জন্য আরও সহজ হয়ে যায়।

ইতিহাসের প্রথম ইরতিদাদের ফেতনার সময়ে উম্মতের আবু বকরের ভূমিকা কী ছিল তা আমরা জানি। এই ইরতিদাদকে তিনি শক্ত হাতে দমন করেছিলেন কিতালের মাধ্যমে। ইরতিদাদের ফেতনা মোকাবিলার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে খুব চমৎকার একটি আয়াত রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿৫৪﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

---

[১৫৫] সহিহ মুসলিম- ১১৮

[১৫৬] ভূমিকা, নতুন তুফান ও তার প্রতিরোধ।

> হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে কেউ দীন থেকে ফিরে গেলে (ইরতিদাদ), নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এমন এক সম্প্রদায় আনবেন, যাদের তিনি ভালোবাসেন এবং যারা তাকে ভালোবাসে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[১৫৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যখনই ইসলাম থেকে কোনো দল মুরতাদ হয়ে যাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অপর কিছু মানুষকে সামনে নিয়ে আসবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন, যারা তার জন্য জিহাদ করবে। কিয়ামত পর্যন্ত এই মানুষগুলোই হবে আত-তায়িফাতুল মানসুরাহ (আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত দল)।'[১৫৮]

উক্ত আয়াতে ছয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে:

১। আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া।

২। আল্লাহকে ভালোবাসা।

৩। মুমিনদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকা।

৪। কাফেরদের প্রতি কঠোর হওয়া।

৫। আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

৬। সত্য পথে চলতে কোনো তিরস্কারকারীকে পরোয়া না করা।

পুরো আয়াতজুড়ে ইরতিদাদ মোকাবিলা করার সূক্ষ্ম রূপরেখা উল্লেখ করা হয়েছে। ফেতনার মোকাবিলায় বিজয়ী হতে হলে অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য এবং ভালোবাসা লাগবে। এ ছাড়া বিজয় অর্জন করা অসম্ভব। আর আল্লাহর ভালোবাসা এবং সাহায্য পেতে হলে অবশ্যই আল্লাহর প্রতি আমাদের গভীর ভালোবাসা থাকতে হবে। আল্লাহকে ভালোবাসার কী অর্থ? ইসলামের প্রতি আনুগত্য এবং মুসলিমসমাজের প্রতি দায়িত্বশীল

---

[১৫৭] সুরা মায়িদা- ৫৪-৫৫

[১৫৮] আল ফাতাওয়া, ১৮:৩০০

থাকাই আল্লাহকে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। আরো স্পষ্ট করে বললে 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র উপর আমল করার অর্থই হলো আল্লাহকে ভালোবাসা। আল্লাহর জন্যই ভালোবাসতে হবে, আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করতে হবে। আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র মুসলিমদের প্রতি সদয় হওয়া এবং তার শত্রু কাফেরদের প্রতি কঠোর থাকা আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার মাধ্যম। আয়াতে উল্লেখকৃত তিন ও চার নম্বর গুণকেই পারিভাষিকভাবে 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' বলা হয়। এটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে মুসলিমদের একটি আকিদা 'ওয়ালা-বারা'।[১৫৯] এই দুইয়ের সমষ্টিতেই গড়ে ওঠে ইসলামি সভ্যতার সামাজিক সংহতি।

যেকোনো সভ্যতার টিকে থাকার পেছনে নৈতিকতার পাশাপাশি সামাজিক সংহতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতীতের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর টিকে থাকার পেছনে দার্শনিকরা এই সংহতিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। ইবনে খালদুনের ঐতিহাসিক সামাজিক ধারাসমূহের অন্যতম হলো এই সংহতি, যাকে তিনি 'আসাবিয়্যাহ' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। অন্যান্য সভ্যতায় এই সংহতি গড়ে ওঠে বংশ-গোত্র-রাষ্ট্র ইত্যাদির ভিত্তিতে। কিন্তু ইসলামি সভ্যতায় এই সংহতির ভিত্তি হলো দীনি ভ্রাতৃত্ববোধ। এর থেকে শক্ত এবং দৃঢ় কোনো বন্ধন থাকতে পারে না পৃথিবীতে, যে বন্ধন গড়ে ওঠে কেবল আল্লাহর জন্য। ওয়ালা-বারা আঘাত করে পাশ্চাত্য মানবতা আর কথিত সম্প্রীতির উপর। নিশ্চিহ্ন করে ফেলে জাতীয়তাবাদের জাহেলি চেতনা। পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে সভ্যতার এই লড়াইয়ে ওয়ালা-বারার চেতনার কোনো বিকল্প নেই।[১৬০]

মুসলিম সমাজে ইরতিদাদের এই স্রোত বন্ধ করতে হলে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো ইরতিদাদের বলয় ভেঙে ফেলতে হবে কিতালের মাধ্যমে। পশ্চিমা বিশ্ব ইরতিদাদ ছড়ানো এবং বাস্তবায়নের জন্য মুসলিমদেশগুলোতে যে কাঠামো তৈরি করে রেখেছে, কিতালের মাধ্যমে

---

[১৫৯] আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করা। যে কাজে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সন্তুষ্ট, সেই কাজের জন্য যেকোনো কিছু ভালোবাসা। পক্ষান্তরে যে কাজে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অসন্তুষ্ট, তা মনেপ্রাণে ঘৃণা করা।

[১৬০] ওয়ালা-বারা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা' বইটি পড়া যেতে পারে

সেই কাঠামো ধ্বংস করতে হবে। তবেই মুসলিমসমাজ রিদ্দাহর ফেতনা থেকে চূড়ান্তভাবে মুক্তি লাভ করবে। এই আধুনিক রিদ্দাহর মোকাবিলায় আমাদের চূড়ান্ত আদর্শ হতে হবে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

চার

যদি বিভিন্ন জনপদ বা শহরের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং আল্লাহকে ভয় করত, আমি অবশ্যই তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর (সকল) কল্যাণ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা (আমার নিদর্শন বা সত্য) প্রত্যাখ্যান করেছিল। সুতরাং তাদের কুকর্মের জন্য আমি তাদের (শাস্তির) অন্তর্ভুক্ত করেছি।[১৬১]

আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করার ছিলেন না; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।[১৬২]

উল্লিখিত আয়াতসমূহ যেকোনো সভ্যতার পতনের সাথে খুবই প্রাসঙ্গিক। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক সভ্যতারই পতন ঘটেছে। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও সভ্যতার পতনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মৌলিকভাবে প্রতিটি সভ্যতার ধ্বংসের পেছনে কারণ একটিই। আল্লাহর অবাধ্যতা। তিনি যা নিষেধ করেছেন, বিদ্রোহমূলক সেই কাজেই লিপ্ত হওয়া। পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিশেষ বিশেষ কারণে ধ্বংসের মুখে পড়েছে বলে কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। যেমন: ফেরাউন তার সাম্রাজ্যবাদকে প্রভুর স্থানে বসিয়েছিল। এই কারণে তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে। কওমে শুয়াইবের পতনের কারণ ছিল অর্থনৈতিক অসততা, ব্যবসা-বাণিজ্যে ধোঁকা-প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া। কওমে লুত ধ্বংস হয়েছে তাদের বিকৃত যৌনাচারের কারণে। কওমে সাবা অর্থনৈতিক মন্দায় পড়েছে নিজেদের পার্থিব উন্নতি নিয়ে অহংকার ও আত্মতুষ্টিতে ভোগার কারণে। এ ছাড়াও

---

[১৬১] সুরা আরাফ, আয়াত ৯৬

[১৬২] সুরা আনকাবুত, আয়াত ৪০

প্রতিটি সভ্যতার পতনের পেছনে যেই বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত, তা হলো নৈতিক অবক্ষয়।

মজার ব্যাপার হলো, উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ই একত্র হয়েছে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতায়। পাশ্চাত্য মানব-সত্তা এবং সাম্রাজ্যবাদ এখন নিজেকে বসিয়েছে প্রভুর আসনে। তাদের পুরো অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে সুদ ও প্রতারণার উপর, যা আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার শামিল। এই সভ্যতায় আবিষ্কৃত হয়েছে যৌনবিকৃতির নানা প্রক্রিয়া; সমকামিতা, উভকামিতা, অজাচার, পশুকামিতাসহ নানান যৌনবিকৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বাধীনতার মূলনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্থিব উন্নতিই এখানে সফলতার একমাত্র মাপকাঠি। কওমে ফেরাউন, কওমে লুত, কওমে শুয়াইব, কওমে আদ, কওমে সামুদ, কওমে সাবা, রোমান সভ্যতাসহ ৫ হাজার বছরের ইতিহাসের প্রতিটি সভ্যতার পতন-ফ্যাক্টই বিদ্যমান আছে পাশ্চাত্য সভ্যতায়। ঐতিহাসিক বাস্তবতায় বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে অধঃপতনের দ্বারপ্রান্তে। পাশ্চাত্য সমাজে সংহতি আর পারিবারিক বন্ধন বলতে কিছু আর নেই। নৈতিকতার চরম সংকটে জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে এই সভ্যতা। সাম্রাজ্যের অর্থনীতি আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে নানা দিক থেকে। সাম্রাজ্যের গোরস্থানখ্যাত আফগান ভূমিতে আজ নতুনভাবে তাদের কবর রচনা হয়েছে। সাম্রাজ্যের অর্থনীতি, সমরশক্তি এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নতজানু হয়ে শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে খোরাসানের বাহিনীর সাথে,[১৬৩] যে বাহিনীর হাত ধরে পৃথিবীজুড়ে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামি সভ্যতা ইনশাআল্লাহ।

পাঁচ

আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি, যখন বিশ্ব সভ্যতার নেতৃত্বের আসনে বিদ্যমান শক্তিগুলো পতনোন্মুখ। নিশ্চিতভাবে সেই স্থান গ্রহণ করতে যাচ্ছে পৃথিবীকে দীর্ঘ সময় নেতৃত্বদানকারী ইসলামি সভ্যতা। এর সবচেয়ে বড় এবং একমাত্র কারণ হলো ইসলামের সেই মহান আদর্শ,

---

[১৬৩] উল্লেখ্য দীর্ঘ ১৯ বছর যুদ্ধের পর গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ শনিবার, কাতারের রাজধানী দোহায় আমেরিকা ও ন্যাটো জোট আগামী ১৪ মাসের ভেতর আফগানিস্তান থেকে তাদের সকল সৈন্য প্রত্যাহারের শর্তে শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা একে আফগানিস্তানে আমেরিকার পরাজয় হিসেবেই দেখছেন।

যা মানবতাকে মুক্তি দিতে পারে সমস্ত জাহিলিয়্যাত থেকে এবং আমার প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেসব সুসংবাদ, যার উপর ঈমান আনা আমাদের উপর ফরজ। ফলে বর্তমান পৃথিবীর বাস্তবতা, দর্শন, থিউরি সবকিছুই এই সুনিশ্চিত বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করছে। কয়েক যুগ আগেই পাকিস্তানের বিখ্যাত ইসলামি স্কলার ড. ইসরার আহমাদ তার 'মুসলমান উম্মাতুঁ কা মাজি, হাল আওর মুসতাকবাল' গ্রন্থে খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন কুরআনি যুক্তি, রাসুলের ভবিষ্যদ্বাণী, দর্শন এবং থিউরি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, একবিংশ শতাব্দী হলো ইসলামের বিজয়ের শতাব্দী। এ ব্যাপারে কিছু হাদিস খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নিম্নে কিছু হাদিস উল্লেখ করছি :

১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবিদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের মাঝে নবুওয়াত ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চাইবেন। এরপর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন তা উঠিয়ে নেবেন। এরপর আসবে নবুওয়াতের আদলে খেলাফতব্যবস্থা। এটাও আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন থাকবে। এরপর আসবে জালেমের শাসন। এটাও আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করবেন টিকিয়ে রাখবেন। আবার যখন ইচ্ছা করবেন উঠিয়ে নেবেন। এরপর আসবে জবরদখলের শাসন (সম্ভবত পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদের আদর্শিক এবং সামরিক গোলামি উদ্দেশ্য)। এই যুগটাও আল্লাহর চাওয়া মোতাবেক সময়কাল অবশিষ্ট থাকবে। একপর্যায়ে তিনি এটাও উঠিয়ে নেবেন। অবশেষে নবুওয়াতের আদলে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হতে থাকবে। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ হয়ে যান।[১৬৪]

২. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ পুরো পৃথিবীকে আমার সামনে তুলে ধরেছেন। আমি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত গোটা জাহান দেখতে পেয়েছি। জেনে রাখো, আমি যা দেখতে পেয়েছি তার সর্বত্রজুড়ে আমার উম্মতের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।[১৬৫]

---

[১৬৪] মুসনাদে আহমদ- ৪/২৭৩

[১৬৫] সুনানে আবু দাউদ--হাদিস নং ৪২৫২

৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীর বুকে কোনো ইটের ঘর কিংবা পশমের তাঁবু এমন থাকবে না, যেখানে ইসলাম প্রবেশ করবে না। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে, তার ঘরে সম্মানের সাথে আর যে ইসলাম গ্রহণ করবে না তার উপর বিধান ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করে লাঞ্ছনার সাথে প্রবেশ করবে। বর্ণনাকারী মনে মনে বললেন, তখনই মহান আল্লাহর এই আয়াতটি পূর্ণতা লাভ করবে।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

তোমরা কিতাল করতে থাকো যতক্ষণ না সমস্ত বাতিল ও ফেতনা নির্মূল হয় এবং পূর্ণরূপে সর্বত্র আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৬৬]

মোটকথা, পৃথিবীতে আল্লাহর দীন আবার প্রতিষ্ঠিত হবে- এটা সুনিশ্চিত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই নিশ্চিত বাস্তবতার দিকে পৃথিবীর যাত্রাপথে আমরা সঙ্গী হতে চাই কিনা কিংবা সঙ্গী হতে পারব কিনা। পৃথিবী ঠিক আপন পরিণতির দিকে ফিরতে থাকবে। এই মহান যাত্রায় আমাদের মোবারক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে কঠিন পরীক্ষার পথ পাড়ি দিতে হবে। ভয়-ভীতি, ক্ষুধা-বিপর্যয়, জান-মাল ধ্বংসের আশংকা দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের পরীক্ষা করবেন।[১৬৭]

ঈমানের উপর চতুর্মুখী আঘাত আসবে। ঘন কালো ফেতনা বর্ষণ হবে তাসবির দানার মতো। ইরতিদাদের ফেতনা, দাজ্জালের ফেতনা আসবে। একজন সকালে মুমিন থাকলে বিকেলে কাফের হয়ে যাবে। বিকেলের মুমিন রাতে মুরতাদ হয়ে যাবে।[১৬৮]

বস্তুবাদী দর্শনের কবলে পড়ে মানুষ ঈমান হারাতে থাকবে। যারা ফেতনার সময় ঈমানের উপর অটল থাকতে চাইবে, হাতে আগুনের অঙ্গার তুলে নেওয়ার মতো সাহসী মনোবল থাকতে হবে তাদের। তাদের মর্যাদা হবে আল্লাহর কাছে সাহাবিদের মতো।[১৬৯]

---

[১৬৬] সুরা আনফাল, আয়াত ৩৯

[১৬৭] সুরা বাকারা, আয়াত ১৫৩

[১৬৮] মুসলিম- ২১৩

[১৬৯] হাকিম, ৭০৭৫; দারেমি, ২৭৪৪; আহমাদ, ১৬৫২৮; মুজামুল কাবির, ৩৫৩৭-৩৫৪০

বি.দ্র.: এখানে শেষযুগের ফেতনার সময়ে মুমিনদের বিশেষ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে, হুবহু সাহাবায়ে কেরাম বা শ্রেষ্ঠ তিনযুগের লোকদের মতো নয়। কেননা তাদের ফজিলত কুরআন ও হাদিসে এসেছে।

পরিবর্তন আসবে অবশ্যই, তবে খুব জটিল ও ভয়াবহ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এক সভ্যতার পতন হয়ে যখন আরেক সভ্যতার উত্থান আসে, তখনকার পরিবর্তনটা খুব সহজেই এসে যায় না। এর জন্য বিদ্যমান অবস্থার উপর দিয়ে এক ট্রাজেডি বয়ে যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রতিটি সভ্যতার উত্থানের গল্প এমনই। এতো কিছুর পরেও ইসলাম এগিয়ে যাবে। ইসলাম আমাদের মুখাপেক্ষী নয়, আমরা ইসলামের মুখাপেক্ষী। আহমাদ দিদাত বলেন, 'ইসলাম জিতবেই তোমাকে নিয়ে অথবা তোমাকে ছাড়াই। কিন্তু ইসলাম ছাড়া তুমি হেরে যাবে।'

এই সফরে নিজেকে শামিল করতে হলে প্রথমেই নিজের ঈমান ও বিশ্বাসকে পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসন থেকে মুক্ত করতে হবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার যেকোনো চিন্তাভাবনার স্পর্শ থেকে ঈমানকে রাখতে হবে স্বচ্ছ। লিবারেলিজম, হিউম্যানিজম, সেক্যুলারিজম, ফেমিনিজমসহ সকল পাশ্চাত্য ইজম নানা রঙ, আয়োজন ও আগ্রাসনের সাথে ঈমানের জন্য হুমকি হয়ে আসতে থাকবে। মুমিনের ঈমান হরণ না করে তারা ক্ষান্ত হবে না।[১৭০] নিজেদের দীন ও শরিয়তের আদি অবস্থান আঁকড়ে ধরতে পারার মাঝেই রয়েছে ঈমানের সুরক্ষা।[১৭১] পাশ্চাত্য সব আয়োজন ও আগ্রাসনের হতাশা আর ভয়কে কাটিয়ে যদি আমরা নিজেদের ঈমান স্বচ্ছ রাখতে পারি, তবেই ইসলামের বিজয়ের মিছিলে আমরা জায়গা করে নিতে পারব ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

> তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিতও হয়ো না; তোমরাই জয়ী হবে; যদি তোমরা মুমিন হও।[১৭২]

ঈমান সংরক্ষণের দায়িত্বের পর আরেকটি দায়িত্ব বর্তায় আমাদের উপর। আর তা হলো ঈমান অনুযায়ী আমল করা। এই আমলের ব্যাপ্তি অনেক বিস্তৃত। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত এগুলো ইসলামের বুনিয়াদি আমল;

---

[১৭০] সুরা বাকারা, আয়াত ১২০

[১৭১] এই উম্মতের শেষ অংশের মুক্তি সেই পথেই হবে, যে পথে তার প্রথম অংশ মুক্তি লাভ করেছিল। (আশ-শিফা, ২/৭১)

[১৭২] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৯

কিন্তু ইসলাম এর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। ফলে আমরা যদি ব্যক্তিগত আমলের পাশাপাশি ইসলামকে পৃথিবীতে বিজয়ী করার কর্মসূচি গ্রহণ না করি তবে ইসলামের বিজয়-যাত্রার সৈনিক হওয়ার স্বপ্ন দেখা হবে আকাশ-কুসুম কল্পনা। এতে তৃপ্তির ঢেকুর নেওয়া যেতে পারে বটে; কিন্তু সত্যের কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়তে হবে। ঈমানের স্বচ্ছতা ও তার দাবি অনুযায়ী কর্মসম্পাদনের পরের স্তর হলো আল্লাহর ওয়াদার বাস্তবায়ন। তিনি ওয়াদা দিয়েছেন, যারা এই স্তর-দুটো অতিক্রম করবে, তারাই বিজয়ী কাফেলার সৈনিক হতে পারবে। ইরশাদ হয়েছে,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

> তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও সৎকর্ম করবে, আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করবেন; যেমন তিনি দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন সেই দীন, তিনি তাদের জন্য যেই দীন মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতি দূর করে তিনি নিরাপত্তা দান করবেন। তারা ইবাদত করবে আমার, আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না।[১৭৩]

আয়াত-দুটি আমাদের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে মুমিন থাকার শর্তে বিজয় ও তামকিনের সুসংবাদ দিয়েছেন। সুরা নুরের আয়াতটির শেষের দিকে আবার ঈমানের স্বচ্ছতার কথা এনেছেন। যাদেরকে তিনি রাজত্ব দান করবেন, যাদের ভয়ভীতি দূর করবেন এবং যাদের দীন প্রতিষ্ঠিত করবেন, তাদের প্রধান গুণ হবে ঈমানের স্বচ্ছতা। শুধু এই আয়াতের তাদাব্বুর করলেই আমাদের মুক্তির

---

[১৭৩] সুরা নুর, আয়াত ৫৫

পথ বেরিয়ে আসবে। পুরো বিশ্বে কাফেরদের রাজত্ব চলছে, তাদের আদর্শ আজ ভূপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; এই অবস্থা মুমিনের জন্য কখনোই প্রশান্তির নয়। মুমিন কুফরের দাসত্বময় ব্যক্তিগত সুখী (!) জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। পারে না আরাম-আয়েশে মত্ত থাকতে। কুফুরের স্বর্গে শান্তিতে বসবাস করা মুমিনের জন্য আমান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। মুমিনের ভয়-ভীতি তখনই দূর হবে, পৃথিবীতে তাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন পৃথিবীকে তারা শাসন করবে। তাদের দীন প্রতিষ্ঠিত হবে। আয়াতটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুমিনদের যেসব বিষয় দান করার কথা উল্লেখ করেছেন, তার ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়। আল্লাহর রাজত্ব, তথা খিলাফাহ, শরিয়ত প্রতিষ্ঠা তারপর শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চিয়তা। পৃথিবীতে মুসলিমদের রাজত্ব নেই, ইসলামি শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত নেই, মুমিনরা সব জায়গাতেই ভয়ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। উত্তরণের প্রথম ও শেষ হাতিয়ার হলো ঈমানের স্বচ্ছতা। আয়াতের শুরুতেও ঈমানের কথা শেষেও ঈমানের কথা বলা হয়েছে।

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, আয়াতের শেষে এসে ঈমান ও তাওহিদের বিশেষ একটি শাখার কথা বলা হয়েছে। উবুদিয়্যাত বা উলুহিয়্যাতের কথা। দাসত্বের ক্ষেত্রে কাউকে শরিক না করা। আল্লাহ ছাড়া কারো উবুদিয়্যাত মেনে না নেওয়া। আজ মুসলিম উম্মাহর প্রধান সমস্যা এই তাওহিদ না-বোঝা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সামগ্রিকভাবে ঈমানের কথা বলে শেষে বিশেষভাবে তাওহিদুল উলুহিয়্যাতকে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান সংকটকালে এখানে আমাদের জন্য ভাবার যথেষ্ট উপাদান রয়েছে।

একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বশেষ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম আমাদের কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছে। আমাদের দায়িত্ব হলো আগে সমস্যা চিহ্নিত করা তারপর সংশ্লিষ্ট সমাধানের পথে হাঁটা। পাশ্চাত্য যদি হয় ইতিযালের ফেতনা, তা হলে এর মোকাবিলা করতে হবে শরয়ি মূলনীতি মেনে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আপসহীন দাওয়াহর মাধ্যমে। পাশ্চাত্য যদি হয় ইরতিদাদের ফেতনা, তা হলে একে নির্মূল করতে হবে জিহাদ এবং ওয়ালা-বারা দিয়ে। পাশ্চাত্য যদি হয় দাজ্জালি ফেতনা, তবে তাকে দমন

করতে হবে কিতালের মাধ্যমে। আর এই সবকিছুর মূলে থাকবে আমাদের বিশুদ্ধ ঈমান, যেই ঈমানে শুধু তাওহিদুর রুবুবিয়্যাতই থাকবে না, তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ এবং তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাতও সমানভাবে অবস্থান করবে। সভ্যতার এই লড়াইয়ে প্রধান অস্ত্র হবে বিশুদ্ধ তাওহিদের প্রতি অবিচল বিশ্বাস। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের সহায় হোন। আমিন।

সমাপ্ত

পাঠকের পাতা